প্রতীক্ষার বাগান

আশাপূর্ণা দেবী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৬৪ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোঃ
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

কল্যাণীয়া শ্রীমতী শুচিস্মিতা

ও

কল্যাণীয় শ্রীমান অরূপ

যুগল করকমলেষু

১

হাতের কাছে হাতিয়ার বলতে কিছু খুঁজে না পেয়ে, একখানা ভাঙা খুন্তির বাঁট দিয়ে মাটি কোপাবার চেষ্টা করছিল প্রতীক্ষা, কিন্তু জুত হচ্ছে না।

মাটি কি আর 'মাটি' আছে? বাড়ি বানানেওয়ালা মিস্ত্রীরা তো তার বারোটা বাজিয়ে রেখে গেছে। মাপাজোপা জমি, টায়টোয় বাড়ি। নেহাত যে জমিটুকু না ছাড়লে আইনের দায়ে পড়তে হয়, সেইটুকুই ছাড়া। তা সত্ত্বেও আইনকে কলা দেখিয়ে ওখানটায় কোনো একটা কিছু করা যায় কিনা, তারই জল্পনা-কল্পনা চলছে।

তবে সে পরামর্শ ভুবনবিজয় আর নীহারকণার মধ্যে আবদ্ধ আছে। প্রতীক্ষা জানে না। জানবার কথাও নয়। প্রতীক্ষা তাই এ যাবত প্রতীক্ষা করে আসছে কবে মিস্ত্রীরা তাদের বাঁশ-দড়ি, খোন্তা-কোদাল, মশলামাখা কড়া আর চুন ভেজাবার ড্রামগুলো নিয়ে বিদায় হবে। প্রতীক্ষা ওই ফালি জমিটুকুতে তার স্বপ্নের ফসল ফলাবে।

এতোদিনে হয়েছে বিদায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ঠিক যে কোণটায় রজনীগন্ধা লাগাবে ভেবেছিল প্রতীক্ষা, সেইখানটাতেই চুন-সুরকির 'তাগাড়' মেখে মেখে মাটিটাকে পাথর বানিয়ে ফেলেছে ওরা।

আহা, মিস্ত্রীরা থাকতে থাকতে যদি প্রতীক্ষা ওদেরই শরণাপন্ন হতো। শাবল কোদাল কত কী ছিল ওদের।

মিনতি-বাণী নিবেদন করে, আর 'চা খেও' বলে কিছু হাতে গুঁজে দিয়ে, কাজটা করিয়ে নেওয়া যেত। ওরা পাঁচ মিনিটেই ওই চাপড়া সরিয়ে নীচের নরম মাটি বার করে দিয়ে যেত। তখন ওটা খেয়াল হয় নি।

হবে কি, প্রতীক্ষারও যে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর মতো মন্ত্রগুপ্তি। সেও তো সমরবিজয়ের কাছে চুপিচুপিই তার বাসনা ব্যক্ত করে ফুলগাছের চারা আর বীজ এনে দেবার আবেদন করে রেখেছে আর আরো আবেদন,

ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয় এখুনি।

একেবারে ফুল ফুটিয়ে 'তাক' লাগিয়ে দেবার জন্যে এ গোপনতা নয়, সে আশা করে না প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার সামান্যতম নড়াচড়াও নীহারকণার চোখ এড়ায় না, এবং তার কারণ সন্ধানে তৎপরতার অভাব নেই তাঁর। একটু কানে গেলেই হয়তো প্রতীক্ষার 'বাগানের' খবর তাঁর নব-পরিচিতা পড়শিনীরাও জেনে ফেলবে। সে বড় লজ্জার। ফুল ফুটবে কিনা তার ঠিক নেই।

বড় সামান্য নিয়ে গালগল্প ওই মহিলাটির।

দেখছে তো ক'বছর প্রতীক্ষা। আর সেই গালগল্পের সূত্র ধরে চারাগাছ মুহূর্তে পল্লবিত হয়ে ফল ধরায়। এই তো কিছুদিনের কথা, প্রতীক্ষার চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে? বিয়ের আগে থেকেই তো প্রতীক্ষা 'কল্যাণীতে' একটা স্কুলে চাকরি করছিল, হঠাৎ বিয়েটা হয়ে গেল, কলকাতায় চলে আসতে হলো। বাধ্য হয়েই সে চাকরি ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু নতুন করে চেষ্টাও ছাড়ে নি প্রতীক্ষা। দরখাস্ত ছেড়েই চলেছে তলে তলে।

প্রতীক্ষার মা বলেছিল, আবার চেষ্টা চালাচ্ছ? তা ওদের মত নিয়েছ তো? অনেকে আবার বৌয়ের চাকরি করা পছন্দ করে না।

প্রতীক্ষা মাকে অভয় দিয়েছিল, ওসব আবার আজকাল আছে নাকি? আসলে প্রতীক্ষা খোদ জায়গা থেকেই ভরসাটা পেয়ে গিয়েছিল। যার বৌ, সে শুনে বলে উঠেছিল, আপত্তি? বল কি? আমি তো ভাবতাম বিয়ের আগে ওপরওলাদের কাছে একটা কনডিশন দিয়ে রাখি, 'চাকুরি-রতা পাত্রী আবশ্যক।' আর সব ওনাদের ডিপার্টমেন্ট। তা বলার আগেই তো, মানে, সেই যে জল-না-চাইতেই মেঘ না কি বলে—

জল না চাইতেই মেঘ?

প্রতীক্ষা হেসে গড়াবার মতো ধাতের মেয়ে নয়। তবু সেদিন প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল হেসে।

সদ্য বিয়ের উচ্ছল আনন্দ, নতুন বরের এবং সুন্দর বরের ইচ্ছাকৃত মজার মজার কথা বলা, প্রথম প্রথম স্বভাবটা একটু পালটে দিয়েছিল প্রতীক্ষার। সেটা ক্রমশঃ থিতিয়ে গেছে। সমরই কি আর বৌয়ের হেসে গড়ানো মূর্তি

দেখবার বাসনায় অবিরতই মজার কথার চাষ করে যাবে ?

তা সে যাই হোক, ভরসা পেয়ে প্রতীক্ষা চেষ্টা চালিয়ে চলেছিল, ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেল ভবানীপুরে একটা মেয়ে স্কুলে চাকরি। কিন্তু যেদিন ইনটারভিউ লেটার এলো ? সেইদিনই নীহারকণার দ্বারা বাহিত হয়ে সারা ভবানীপুরে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেল, নতুন বৌ চাকরি করবে। এক কথায় পেয়ে গেছে। কী অস্বস্তি !

ভাগ্যিস সত্যিই পেয়ে গেল।

না হলে, কী লজ্জার কথাই হতো। ভবানীপুরের এই জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের সামনে মুখ দেখাত কী করে নতুন বৌ ? ও বাবা, সে কি কম বিরাট গোষ্ঠী ?

তা এখন তো আবার সেই গোষ্ঠীচ্যুত হয়ে এই নতুন পাড়ায় চলে আসতে হয়েছে ভুবনবিজয় চৌধুরী আর নীহারকণা চৌধুরীকে। অতএব তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদেরকেও।

ভাগের বাড়ির ভাগীদাররা সকলে একমত হয়ে ঠাকুর্দার আমলের সাবেকি বাড়িখানাকে বেচে ফেলে যে যার হিস্যা নিয়ে নিজ নিজ আস্তানার ব্যবস্থা করে ফেলতেই এই মুক্তি, প্রতীক্ষা নামের মেয়েটার। বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠত সে, ওই বৃহৎ বাড়িখানার একাংশের একটু খুপরিতে। খুপরিই। কারণ সাবেকি বড় মাপের ঘরটাকে পার্টিশান দিয়ে দুটো ঘর বানানো হয়েছিল সমরবিজয়ের বিয়ের সময়। নচেৎ রণবিজয়টা যায় কোথায় তার বইখাতা, আর সিঙ্গল খাটখানা নিয়ে ? দুই ভাই তো একই ঘরে শুতো। পার্টিশান দেওয়া সেই ছায়া-ছায়া চাপা-চাপা ঘরটা এক এক সময় মনকে বড় বিষণ্ণ করে তুলতো।

শহরতলির এই নতুন পাড়ায় ছোট জমি, ছোট ছোট ঘর, উঠতে বসতে অপছন্দ করছেন নীহারকণা। হাত পা মেলবার জায়গা পাচ্ছেন না নাকি তিনি। কিন্তু প্রতীক্ষা যেন বেঁচে গেছে। শ্বশুরের জ্ঞাতিবর্গের সদ্বিবেচনায় সে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত।

সে তো দেখছে এখানে মনটাকে মেলে দেবার অগাধ জায়গা পাওয়া গেছে। এদের ঘেরা প্রাচীরের ও-পারে কাদের যেন জমি কেনা পড়ে আছে।

তার মালিক এখনো কর্মরত বদলির চাকরি। রিটায়ার করে এসে এখানে বাড়ি বানিয়ে গুছিয়ে বসবেন। তাই সময়মতো জমিটা সংগ্রহ করে রেখেছেন, ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে কি না যাবে চিন্তায়।

তা যেমন শুনেছে, সে ভদ্রলোকের কর্মবিরতির এখনো বছর পাঁচ ছয় দেরি। ততদিন তো প্রতীক্ষা একটু আকাশ দেখে বাঁচুক, একটু দাক্ষিণের বাতাসের স্পর্শ পেয়ে নিক। পেয়ে নিক তাদের 'কল্যাণী'র বাসার স্বাদ। সেও তো ছোট বাড়ি, বাবার কোয়ার্টার্স, তবু ছোট্ট একটু বাগান আছে সেখানে। সব বাড়ি বাড়িতেই আছে।

প্রতীক্ষা সেই বাগানটার ভার নিয়ে রেখেছিল, অনেক ফুল ফুটিয়েছিল। তাই ভবানীপুরের ওই ইটের পরে ইট দেখে মনটা দমে গিয়েছিল। তা ছাড়া ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই কত রকম মুখ। একদা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার ছিল। তখন সেটা ভেঙেচুরে 'অন্ন'টা আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, কিন্তু এক রয়ে গেছে দালান, সিঁড়ি, প্যাসেজ, উঠোন, কলতলা, স্নানের ঘর। বড় বিশ্রী সেই পরিস্থিতি।

এখানে কী আরাম।

দর্শনীয় মুখের সংখ্যা আঙুল গোনা।

বহু কণ্ঠের কলরোলে সকালের শান্তিটা দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যায় না। একা নীহারকণা অবশ্য কিছুটা মোহড়া নেন। তবু পাঁচটা সংসারের আলাদা আলাদা উনুনের ধোঁয়া আর ভাত ডাল অফিস ইস্কুলের সমারোহময় শব্দতরঙ্গের কতটুকু আর একা পেরে ওঠেন তিনি? পাঁচ বাড়ির পাঁচটা কাজ করবার লোকও তো ছিল? তাদের করাল কণ্ঠও ছিল। উঠোন নিয়ে কাড়াকাড়ি, কল নিয়ে কাড়াকাড়ি। উঃ।

তবে ওই ইস্কুলের চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল প্রতীক্ষা নামের কলরোলভীত মেয়েটা। ইচ্ছে করে মর্নিং সেকশান বেছে নিয়েছিল সে।

নতুন বাড়িতে এসে অবশ্য মনে হচ্ছে—দুপুরের সেকশানের হলেই ভালো হতো। সকালটায় সমর বাড়ি থাকে, রণু বাড়ি থাকে। ওদের সঙ্গটাই তো এ সংসারের সুখ, আনন্দ। তা ছাড়া রান্নাঘরের কাজে কর্মে নীহারকণার সাহায্য করতে না পারায় একটু অপরাধবোধও আসে। আপাততঃ

উপায় কী ? তলে তলে চেষ্টা করছে যদি ওটা বদলে নেওয়া যায়। তলে তলেই। কোনো কিছু না হওয়া পর্যন্ত বলে বেড়াতে চায় না প্রতীক্ষা। যদি না হয় ?

ফুলগাছের চারা পুঁততেও তাই প্রতীক্ষা এখন একক প্রচেষ্টায় খুন্তিভাঙা নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে কাটারি দিয়ে কিছু কিছু খুঁড়েছে। কিন্তু চারা পুঁততে একটু গভীর গহ্বরের প্রয়োজন তো ? নইলে কোথায় শিকড় নামাবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ?

পড়ন্ত বিকেলের হাওয়া বড় প্রাণ জুড়নো।
যদিও এই ফালি জমিটার গা থেকেও উঠেছে বুক সমান ঘের প্রাচীর, তবু দাক্ষিণের দাক্ষিণ্য একটা স্বর্গীয় জিনিস। ঘাম ঘাম কপালটা মাঝে মাঝেই সেই স্বর্গীয় স্বাদে স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর মনে পড়ে যাচ্ছে বাবার কল্যাণীর কোয়ার্টার্সের সেই বাইরের বারান্দাটুকু।
কলেজের কাজ প্রদীপ রায়ের।
বেলা পাঁচটার মধ্যেই এসে পড়তেন। একটা বেতের ইজিচেয়ারে বসতেন এসে ওই বারান্দাটায়।
প্রতীক্ষা বাগানের সেবা করতে করতে বাবাকে দেখতে পেলেই ছুটে এসে কাছে বসে পড়তো। আর এই স্নিগ্ধ স্বাদটা তখনই পেতো। ঘাম ঘাম কপালে আর গলায় বিকেলের স্বর্গীয় হাওয়াটা এসে লাগতো তো। অবশ্য সেখানে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমকে আলাদা করার প্রশ্ন ছিল না। বাতাস আসতো চারিদিক থেকে। আর বাবা ? সে যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়া একটা আলোর ঝরনা।
মার কাছ থেকে অনেকটা দূরত্ব ছিল প্রতীক্ষার।
সব অন্তরঙ্গতা তো বাবার সঙ্গে।
মাটি খোঁড়বার চেষ্টার সঙ্গে বাবাকে এতো মনে পড়ছে কেন ? সেই কবে কোন্‌দিন বাবা এই কথাটা বলেছিলেন বলে ? বলেছিলেন, বাগান করা তাড়াহুড়োর কাজ নয় পিতু ? চারাকে নরম মাটিতে ভালো করে গভীরে

পুঁততে হয়, সারের মাটিকে কাঁকর কুলুই বেছে তৈরি করে নিতে হয়, আন্দাজ বুঝে জল দিতে হয়। তুমি যদি অতি উৎসাহে বালতি বালতি জল ঢালো, বেজে যাবে গাছের বারোটা। আবার একদিন যদি জল দিতে আলস্য করো তাহলেও বিপদ।

পিতু বলেছে, তবে যে মা বলেন, ফুলগাছে বেশী বেশী জল না দিলে বেশী বেশী ফুল ফোটে না।

প্রদীপ রায় হেসেছিল।—তোর মা তো 'সবজান্তা নাম্বার ওয়ান'। ফুল যখন ফুটতে শুরু করে, তখনকার ট্রিটমেন্ট তো চারার ওপর চালালে চলে না।

২

চির অভ্যাসমতো বেলা তিনটেয় ভাত খেয়ে অবেলায় ঘুমিয়ে উঠে ফুলো ফুলো ভারী মুখে নীহারকণা চৌকিতে বসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, বৌমাকে দেখতে পাচ্ছিনে যে?

ভুবনবিজয়ের অভ্যাস আলাদা।

অথবা একই। তিনিও চির-অভ্যাসমতো কাজই করেন। সকাল সকাল খেয়ে নেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনের অনিয়মের স্বাধীনতাটুকু ভোগ করতে চান না। অতএব তাঁর দিবাবিশ্রাম সারা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ঘুম থেকে উঠে এক গেলাস মিছরির শরবত খেয়ে সকালের খবরের কাগজ খানাই আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন। কাছে দু' একটা বইও রাখা আছে। ইচ্ছে হলে পড়বেন।

ধর্মপুস্তক অবশ্য নয়। ওসবের ধার বড় ধারেন না ভদ্রলোক। আপাততঃ দেখা যাচ্ছে (দুটো বইয়ের ওপরেরটা) 'বাংলা নাট্যমঞ্চের একশো বছর'।

যৌবনে একটু নাটক-পাগল ছিল লোকটা। অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্য পরিচালনার ভারও নিতেন মাঝে মাঝে, আবার কোনো কোনো ভূমিকায় নেমেও পড়তেন প্রথমে 'অনিচ্ছের' ভান দেখিয়ে। নীহারকণার মধ্যে নাট্যরসের বোধের বালাইমাত্র নেই। তবু দুজনের ভাবের অভাবও

নেই। ভুবনবিজয়ই সেই ভাব-কে রক্ষা করে আসছেন।

নীহারকণার প্রশ্নে অনায়াসেই বলতে পারতেন ভুবনবিজয়, এখন কি তোমার দৃষ্টির এলাকায় বৌমার থাকবার কথা ?

কিন্তু তা বলে গিন্নীকে চটালেন না।

একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠার ভঙ্গিতে বললেন, এই তো একটু আগেই ওখানে ছিল। আমায় শরবত দিয়ে গেল। ডেকে দেব ?

নীহারকণার রংটা খুব ফর্সা, চুলগুলো এখনো কালো কুচকুচে, সামনেটা আবার ঝুরো ঝুরো কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। এখনো এ মুখের দিকে তেমন করে তাকালে ভুবনবিজয়ের মনটা মুগ্ধরসে আপ্লুত হয়ে আসে। তাই তাড়াতাড়ি উঠতে যান বৌমাকে ডেকে দেবার প্রশ্নে।

নীহারকণা অবশ্যই এ মুগ্ধতার খবর রাখেন, তবে প্রকাশ করেন না সেই রাখার খবরটা। কোনো কালেই না। যৌবনেও যা, এখনও তা। একই ভঙ্গী। কখনো মোহিনীমায়ার বিস্তারের চেষ্টাও করেন না, কখনো নিজে গদগদও হন না। নীহারকণার মোহিনীমায়ার ভঙ্গিই হচ্ছে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী।

এখনো সেই ভঙ্গিতেই বলেন, তুমি আবার ডেকে দিতে উঠবে কী ? আমার পা নেই ? না গলা নেই ?

কর্তার কথার শেষাংশটা তাঁর ভালো লাগে নি।

বৌ মিছরির শরবতটুকু দিয়েছে, সেটা আবার জাহির করে বলার কী আছে ? মিছরি তো নীহারকণাই ভিজিয়ে রেখেছিলেন, নেবুটা পর্যন্ত কেটে রেখেছিলেন। বৌ একটু ঢালা-উগরো করে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। তাতেই একেবারে কেতাত্থ হয়ে গেছেন।

কথাটা বলতেও ছাড়েন না।

জানান দিতে তো হবে সব ক্রেডিটটাই বৌয়ের নয়। বেজার গলায় বললেন, হুঁশ করে মিছরি ভিজিয়ে নেবু কেটে রেখে তবে শুই। বৌ একটু ঢেলে উল্টে হাতে ধরিয়ে দিয়ে মাথা কিনেছেন।...

আহা মাথা কেনার কথা কেন ?

ভুবনবিজয় তাড়াতাড়ি বলেন, এই এক্ষুনি এখানে ছিল, সেই কথাই তো

বলছি।

নীহারকণা যে কেন এতো গুছিয়ে রাখেন তা তাঁর অগোচর নয়। কিন্তু সেকথা কোনোদিন তোলেন না কর্তা।

আস্তে আস্তে আগে ফর্সা ফর্সা গোবদা গোবদা পায়ের পাতা দু'খানা মাটিতে নামিয়ে, এলোমেলো আঁচল গুছিয়ে, এলোচুল হাতে জড়িয়ে চৌকি থেকে নেমে দাঁড়াল নীহারকণা।

ভুবনবিজয়ের চোখ অনেকক্ষণ আগেই খবরের কাগজ থেকে উঠেছে। এখন অন্যত্র। বলে উঠলেন, আজকাল আর আলতা পরতে দেখি না যে?

এটা কি ভুবনবিজয়ের শুধুই প্রেমের প্রকাশ? না কি রণস্থলে নামার পূর্বে নীহারকণার মনটাকে একটু নরম করে রাখার চেষ্টা?

কিন্তু নীহারকণা কি সেকালের 'বৌ পীড়নকারিণী' গিন্নী? মোটেই না। উঁচু গলায় বৌকে একটু বকাঝকাও তো করতে দেখা যায় না। তবু ভুবন-বিজয়ের যেন এরকম একটা চেষ্টা আছে।

পান দোক্তা খেয়ে খেয়ে কালচে হয়ে যাওয়া একদার টুকটুকে ঠোঁটটা উলটে নীহারকণা বিদ্রূপের গলায় বলেন, তবু ভালো যে, আমার পায়ের দিকে নজর পড়েছে এতোদিনে।

ভুবনবিজয় এদিক-ওদিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলেন, এতোদিন মানে? ওই চরণেই তো বাঁধা পড়ে আছি চিরকাল।

থাক আর নাটক করতে হবে না। ভবানীপুর থেকে এসে পর্যন্ত তো ওপাট বন্ধ। নাপতিনী আসে এ পাড়ায়? এমন এক পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাড়ি করলে। এমন জানলে—আমি বাড়ি বিক্রিতে মত দিতুম না।··· এক-জনের অমতেও আটক হয়, তা জানো তো?

ভুবনবিজয় অবশ্য নীহারকণার থেকে জগতের অনেক কিছুই কম জানেন, তবে এ ব্যাপারে যে নীহারকণাকে সেই 'একজন' ধরা চলতো না সেটুকু জানেন। কিন্তু এসব কথা তিনি বলতে জানেন না। অথবা চান না।

কিন্তু ওপাড়া আর এপাড়ার তুলনামূলক সমালোচনা শুরু হলে যে সহজে না থামতেও পারে সেটা অনুমান করে তাড়াতাড়ি বলেন, নতুন পাড়া

তো ? তা তোমাদের সেই শিশির আলতা নেই ?

আছে সবই। একলা বুড়োমাগী কি আলতা নিয়ে পরতে বসবো? বৌ তো নোখেও ছোঁয়ায় না। আলতা পরে ইস্কুলে যেতে নাকি লজ্জা করে। শুনিনিও এমন কথা !...চাকরির ডাঁট ! সিঁদুর পরে যেতে লজ্জা করে, এইটুকু যে বলেন নি, এই আমার ভাগ্যি।

ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে যান নীহারকণা। এবং মুহূর্তেই আবিষ্কার করে ফেলেন প্রতীক্ষাকে। দেরি হবার তো প্রশ্নও নেই। এ বাড়ির সবটাই তো চোখের ওপর ! একি ভবানীপুরের সেই বাড়ি ? যে একটা মানুষকে খুঁজে পেতে হলে 'ডাক' বসাতে হয়। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েগুলো, আর কাজকরুনী লোকগুলো তো ওই কর্মেই বাহাল থাকতো। বেকার আর হতে পেত না।

রান্নাঘরের পিছনের দাওয়াতে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন প্রতীক্ষাকে।

...খুব শান্ত আর নরম গলায় বললেন, ওখানে কী করছ গো বৌমা ?

শান্ত এবং নরম।

অথচ ভুবনবিজয় সর্বদা ভাবেন নীহারকণাকে সামলে বেড়ানো দরকার।

প্রতীক্ষা কিন্তু ওতেও থমকে উঠল।

কারণ প্রতীক্ষা এতক্ষণ 'কল্যাণী'তে ছিল।

এখানে এসে পড়ে প্রতীক্ষা লজ্জিত হাসি হেসে বললো, মাটিটা একটু খুঁড়ছি।

ওমা ! তোমার আবার মাটি খোঁড়বার কী দরকার হলো ? উনুন ভেঙে গিয়ে থাকে তো ঝি মাগীকে বোলো না।

আরো কুণ্ঠিত হলো প্রতীক্ষা। দ্বিধার গলায় বললো, না না। সে নয়। ভাবছি এখানে কিছু ফুলগাছ বসালে বেশ হয়।

ফুলগাছ ? বাগান ? আহা কী একখানা মাঠময়দান রেখেছে তোমার শ্বশুর, তাই বাগান করবে ? তা আগে ভাগে ওইখানটাই খুঁড়ছ ছাই ?

প্রতীক্ষা হাতের খুন্তিটা নামিয়ে ত্রস্ত হলো। বললো, এখানটায় কী মা ?

না বিশেষ কিছু না। তবে ওখানটায় 'তাগাড়' মেখে মাটিটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে ভেবে রেখেছিলাম, এদিক-ওদিক বাঁশ-বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে

ওইখানে হাত তিনেক জায়গা একটু নীচু মতো চালা করিয়ে নেব গুল, ঘুঁটে, কাঠকুটো রাখতে।

গুল, ঘুঁটে, কাঠকুটো।

প্রতীক্ষা যেখানে রজনীগন্ধার গোছার মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসি দেখছিল। কিন্তু সে কথা তো আর বলবে না প্রতীক্ষা। হাতের খুন্তিটা নামিয়ে রেখে হাত ঝেড়ে হাসিমুখেই বললো, আমিও ভাবছিলাম, এখানে গাছ পোঁতা হবে না। যা শক্ত হয়ে গেছে।

নীহারকণা দয়ার গলায় বলেন, তা যতক্ষণ না তোমার শ্বশুর জমিটাকে কিছু কাজে লাগাচ্ছে, ততক্ষণ এদিকটায় কিছু লাগাতে পারো।

শ্বশুর এ জমিটাকেও কিছু কাজে লাগাবেন?

প্রতীক্ষা অবাক্ হয়ে গেল। ও তো এ পর্যন্তই শুনে আসছে, এটুকু 'ছাড়া' রাখতেই হবে।

প্রায় অর্ধসমাপ্ত বাড়িতে তো এসে উঠতে হয়েছে, অস্থুবিধের একশেষ। ওই স্বর্গভূমিটুকু বোঝাই থেকেছে মিস্ত্রীর জঞ্জালে, প্রতীক্ষা বসে বসে প্রতীক্ষা করেছে কবে কাজ মিটবে। কবে প্রতীক্ষা চারা এনে পুঁতবে।

এখন আবার এ কী ভাষা?

আস্তে বলে, এখানে ঘরটর হবে?

নীহারকণা ইচ্ছে হলে খুব হাসতেও পারেন। গালে চিবুকে টোল খাইয়ে হা হা করে হেসে উঠে বলেন, শোনো মেয়ের কথা! ঘর করার আইন থাকলে তো এক সঙ্গেই হতো। করবে অন্য কিছু।

আসলে ভুবনবিজয়ের এক শখ চেগেছে গরু পোষবার। খাঁটি দুধ তো বাজার থেকে চিরলুপ্ত হয়ে গেছে, শেষজীবনে—যখন শহর ছেড়ে দেহাতেই এসে পড়েছেন, একটু খাঁটি দুধ খেয়ে নেবেন।···আগে তো ভবানীপুরের বাড়িতে গোয়ালারা সামনে গরু দুইয়ে দুধ দিয়ে যেত, বাড়ি থেকে মাজা বালতি সাপ্লাই করা হতো।

ক্রমশঃ সে সব নক্সাদার অভ্যাস সময়ের শিরিষ কাগজের ঘষা খেয়ে খেয়ে সব কারুকার্য হারিয়ে নক্সাহীন হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঘরে হরিণঘাটার বোতল এসে ঢুকতো। যার যেমন সংসার।···এখন এই নক্সার সাধ জেগেছে।

তবে ছেলে বৌয়ের কানে তুলছেন না এক্ষুনি। গরু যোগাড় হবে, দামে ঠিক হবে, বিশ্বস্ত কারো কাছে 'গোপালন' পদ্ধতি শিখতে হবে, তবে তো ?
ছিল তেমন একজন, ভুবনবিজয়ের জানা। অফিসে তাঁরই সমকক্ষ পদের রথীন ঘটক। দত্তপুকুর থেকে আসতো। তাদের বাড়িতে নাকি রীতিমতো গোপালনের কাজ চলতো। মস্ত গোয়াল, অনেক গরু, বাড়িতেই দুধ দই, ছানা, মাখন।
কিন্তু এখন কোথায় রথীন ?
মাঝে মাঝে ভাবেন গেলে হয় একদিন। কিন্তু হয়ে ওঠে না। ঠিক করেছেন মিস্ত্রী বিদায় নিয়েছে, এইবার সত্যিই যাবেন একদিন। গরু কিনিয়েও সেই দিতে পারে।
তা এসব এখন মন্ত্রগুপ্তি আছে।
নীহারকণা ভাবলেন, কর্তার তো। হতে করতে এখন ছ' মাস গড়াবে। ততক্ষণ বৌ দুটো ফুলগাছের চারা পোঁতে পুঁতুক। ফুল ফুটবে তো কত। ওই তো পাঁচিলের আওতা।
নীহারকণার দয়ালু গলা শুনে কেন কে জানে হঠাৎ চোখে জল এসে গেল প্রতীক্ষার। আবেগে নয়, কেমন যেন অপমানের জ্বালায়। অথচ সত্যি অপমানকর কিছু কি বলেছেন নীহারকণা ?
নীহারকণার হাহা হাসির আওয়াজ কানে আসতেই ভুবনবিজয় আশ্বস্ত হন। বাংলা 'নাট্যমঞ্চের একশো-বছর'খানা খুলে ধরেন।
নীহারকণা বললেন, বাগান করবে তো চারা পাবে কোথা থেকে ?
প্রতীক্ষা ধুলো হাতটা আরো ঝেড়ে নিতে নিতে অনিচ্ছের সঙ্গে উত্তর দিলো, বাগান আবার কি ! এমনি দু' একটা যুঁই, বেল, গোলাপ পুঁতলে হয় ভাবছিলাম।
একেবারে চেপে যাওয়াও তো মুশকিল।
আজই তো বলা আছে রণুকে। যদিও চুপিচুপি। কিন্তু হয়তো এনে বসতে পারে। লিস্ট মিলিয়ে আনলে তো আরো অনেকগুলো নাম করতে হয়, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, লিলি।···অতো সব কি আর বলতে ইচ্ছে হয় এই পরিস্থিতিতে ?

কিন্তু নীহারকণা তো কোনো খবরের আদ্যোপান্ত না শুনে ছাড়েন না। তাই আবার ও প্রশ্ন চলে আসে, তা সেই বা পাচ্ছো কোথায় ? পাড়ার কাউকে বলেছ বুঝি ? এ বাড়ি ও বাড়ি ফুলগাছ দেখি তো—

বাঃ পাড়ায় আমি কাকে কি বলব ?

প্রতীক্ষা নির্লিপ্ত গলায় বলে, আমি কাকে চিনি ?

ওমা কেন ? ওই লাল বাড়ির মেয়েটা যে সেদিন এসে কত কথা কয়ে গেল তোমার সঙ্গে ? ভাব হয় নি ?

আচ্ছা, এই সহজ সাধারণ সব কথা প্রতীক্ষাকে এতো ক্লিষ্ট করে কেন ? প্রতীক্ষার কণ্ঠে সেই ক্লিষ্টতার ধ্বনি, এসেছিল, কথা কইল। এর আর ভাব কী ?

ভাব হতে দোষই বা কী ? সমবয়সী তো ? ও, ও তো শুনি কোন্ আপিসে চাকরি করে।

এ কথার উত্তর দেবার দায় নেই।

নীহারকণা আবারও বলেন, তা বল যদি তো ওই হলদে বাড়ির গিন্নীকে বলতে পারি। আমার সঙ্গে তো খুব আলাপ হয়ে গেছে। অনেক গাছ আছে ওদের।

এর থেকে সহৃদয়তা আর কি আশা করা যায় ?

তবু প্রতীক্ষা ভীতভাবে তাড়াতাড়ি বলে, না না, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ওসব তো কিনতেই পাওয়া যায়।

কিনতে !

নীহারকণার ফর্সা ধবধবে মুখটা হঠাৎ একটু কালচে মেরে যায়। বলেন, অ ! সমর এনে দেবে বুঝি ? যাই চায়ের জলটা বসাইগে।

এ কী আপনি বসাবেন কেন ? আমি তো যাচ্ছি।

প্রতীক্ষা ব্যস্ত হয়ে টিউবওয়েলের ধারে হাত ধুয়ে নেয়। আর উত্তরটা দিয়ে দেয়, রণুকে বলে রেখেছিলাম চারার কথা।

রণু ! ও ! নীহারকণা কালচে স্বরে বলেন, বেলা হয়ে গেছে। তোমার শ্বশুরের তো এখুনি—

'এখুনি' কি সেটা না বলেই চলে যান।

রণুকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে নীহারকণার অগোচরে। সেও তো মায়ের কাছে ফাঁস করে যায় নি। ওই তো রূপ, এতো কিসের মোহিনী মায়া।

চা খেতে খেতে আবার কথাটা তুললেন নীহারকণা, বৌমা যে ওখানে বাগান বানাচ্ছে গো!

কোন্ খানে?

চকিত হন ভুবনবিজয়।

পরস্পরে একটা চোরা চোখোচোখিও হয়। নীহারকণা বলেন, ওই যে যেখানটুকুতে তুমি কী যেন করবে বলেছিলে।

না না, ও কিছু না। ও কথা বাদ দাও।

ভুবনবিজয় তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গে মুড়ি সেলাই দেন, আমি তো রাতদিনই অমন রাজাউজির মারি। ছেড়ে দাও।

কিসের বাগান গো মা? আমের না কাঁঠালের না বাঁশের? বাঁশ বাগানে লাভ বেশী।

কথার ধরনে হেসে ফেলে প্রতীক্ষা।

এ মানুষটাকে তার ভালোই লাগে। নিজের বাবার মতন না হলেও ভুলু জ্যাঠা, গোবিন্দ পিসেমশাইয়ের মতন মনে হয়। সাধারণ ধরনেরই মানুষ ইনি। শুধু যদি সদাসর্বদা ওই দেবী পুজোর মন্ত্রপাঠে তৎপর না থাকতেন। বড় চোখে পড়ে।

বড্ড প্রমিনেন্ট ওই পুজোর ঘন্টা স্তোত্রমন্ত্র।

ছেলেরাই বলে, বাবার কথা বাদ দাও। শ্রীমতী নীহারকণা দেবীর চোখে জগৎ দেখেন উনি।···

তা হলেও খারাপ লাগে না লোকটাকে। বরং ভালবাসতেই ইচ্ছে করে। দুর্বলতা হাস্যকর, তবু ক্ষমা করা যায়।

কিছু বলতো প্রতীক্ষা, কিন্তু নীহারকণা সে খাটুনি বাঁচিয়ে দেন তার। বলেন, না গো না ফুলের। বেল, জুঁই, গোলাপ। রণু চারা এনে দেবে। আচ্ছা এর কোন্ কথাটা দোষের? যে প্রতীক্ষার হঠাৎ মনে হয়, অথচ এইখানেই চিরকাল থাকতে হবে আমায়।

৩

মধুর গন্ধে মাছির মতো, চায়ের গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে হাজির হয়েছে বুনোটা। এসেই উঠোনে বসে হাঁক পাড়ে, এলাম গো মা জগজ্জননী।

এ পাড়ায় আসা মাত্রই কোন্ সূত্রে যে বুনো এ বাড়ির চায়ের আসরের একজন সদস্য হয়ে গেল তা কারো মনে নেই। বুনোর হু'বেলা ওই উপস্থিতি ঘোষণার মধ্যে যেন জন্মগত সূত্রের দাবির সুর।

এই "জগজ্জননী"টি যে বাড়ির খোদ গিন্নী নয়, তা নীহারকণা ভালো করেই জানেন। তবু তিনি ওই হাঁক শুনলেই ডাকটা নিজের গায়ে পেতে নিয়ে আগ বাড়িয়ে বলে ওঠেন, এসে পড়লে? মাথা কিনলে! কেতাত্থ করলে আমায়! এসো আমার বাবার ঠাকুর চোদ্দপুরুষ! চায়ের গেলাস নিয়ে বোসো।

ভবানীপুরে বহু সদস্যের বৃহৎ সংসারে কথার চাষটা বড় বেশী পরিমাণে হতো। সে ফসলের সিংহ ভাগটাই বোধহয় নীহারকণার গোলায় উঠেছে।

প্রতীক্ষা যখন ভাবে, মানুষ অকারণ এতো কথা কয়ে কী সুখ পায়?

নীহারকণা তখন মুখের রেখায় রেখায় সুখের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে অকারণ কথার ফুলঝুরি কাটেন। একটা কাককে উদ্দেশ করেও এক কুড়ি কথা কয়ে চলতে পারেন তিনি।

এসেছ কানের কাছে অলক্ষুণে ডাক ডাকতে? যমে তোমাদের নেয় না কেন বলো তো? বিধাতা পুরুষকে ডেকে শুধোতে ইচ্ছে করে, ঠাকুর তোমার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এতো বাহারের মধ্যে এ আপদগুলোকে সৃষ্টি করেছিলে কেন বল তো? জগতের কোন্ কাজে লাগে মুখপোড়ারা? কা-কা করে চেঁচানো ছাড়া?

এই স্বভাব বশেই নীহারকণা বুনোর মতো একটা হাড়হাভাতে হতভাগাকে ডেকে ডেকেও কথার নক্সা কেটে চলেন, কবে তুমি 'শ্রীক্ষেত্তরে' 'আটকে'

বেঁধে রেখেছিলে বাপধন ? তাই বাঁধা নিয়মে এসে—চায়ের গেলাসটি পেতে বসো।···তাও আবার শুধু চা নয়, রুটিটির জোগান চাই।
সকালে দু'খানা বাসী রুটি, আর বিকেলে দু'খানা শুকনো-টুকনো ধার-পাশের পাঁউরুটির চাকা। এই বরাদ্দ বুনোর, তা'ও দুটি বেলা তার খোঁটাটি না দিয়ে ছাড়েন না নীহারকণা চৌধুরী !

প্রতীক্ষা শুনে শুনে যেন মরমে মরে যায়।

কতদিন এমন লজ্জা করে, মনে হয় আড়ালে ডেকে বলে দেয়, এতো অপমানের চা আর খেতে এসো না তুমি বুনো।

কিন্তু তাই কি বলা যায় সত্যি ?

তাছাড়া আড়ালই বা কোথায় ' নীহারকণার যে সর্বত্র চোখ। ছবির মতো বাড়িটি হয়েছে বটে। কিন্তু আড়াল আবডাল বলে কোনো জায়গা নেই। সেটা ছিল বটে ভবানীপুরের বাড়িতে। রাঁধুনি ঠাকুর তার দেশ থেকে বেকার দোস্ত কি ভাইপো-ভাগ্নে আমদানী করে নাকি মাস দু' মাস খাইয়ে শুইয়ে লুকিয়ে রেখে দিত। চাকরি একটা না জোটানো পর্যন্ত যাবে কোথায় সে ?

ষড়যন্ত্র ছিল অন্য দাসদাসীদের সঙ্গে। ফাঁস করে দিত না তারা। কারণ বামুন ঠাকুরের হাতে সকলের ভাত।···এটা অবশ্য একান্নবর্তী কালের কথা। হাঁড়ি ভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাঁধুনি ঠাকুরের স্বর্গ হইতে বিদায় ঘটেছে। তবু বাড়িটা এখনো অনেক রহস্য বহন করবার ক্ষমতা রেখেছে। এখন তো চলে গেছে অন্যের হাতে। দুর্গের মতো সেই বাড়িটা।

ছবির মতো বাড়িতে সে সব সুবিধে নেই।

অতএব মনের লজ্জা মনে চেপেই প্রতীক্ষা চুপচাপ শুনে যায় নীহারকণার বাক্যচ্ছটা। আর বুনোর সামনে নীরবে ধরে দেয় দু'খানা শুকনো রুটি, আর এক গেলাস কালো কালো চা।···আর কারো চায়ের দিকে না হোক বুনোর চায়ের দিকে প্রখর দৃষ্টি থাকে নীহারকণার। চা ঢালা কালেই চাপা গলায় উপদেশ দেন, ওকে আর গুচ্ছির দুধ ঢেলে 'বাবু চা' গেলাতে হবে না বাছা। অত বাহার করলে আরো পেয়ে বসবে।

আর খোলা গলায় বলেন, এসেছ ? মাথা কিনেছ বল।

বুনো অবশ্য 'বুড়ির' বকবকানি গ্রাহ্য করে না, সমান সুরে জবাব দেয়, আপনার কাচে তো আসি নাই। আপনাকে জগজ্জননী বলে ডাকিও নাই।

আজ কিন্তু হঠাৎ রেগে উঠল বুনো।

চড়া গলায় বলে উঠল, দু'খানা শুকনো পাঁউরুটির চাকা, তার জন্যে এতো বাক্যি কিসের ? শুধু চা খেলে পিত্তি বিগড়োয় তা জানা নেই ? কুকুরটা বেড়ালটাও তো শুধু চা মুকে তোলে না।

ভুবনবিজয় অবশ্য এ সব তুচ্ছ কথা কানে নেন না। নীহারকণার কণ্ঠধ্বনি-টাই শুধু হৃদয়ে ভরে ফেলেন, ভাষার ভাবার্থ মাথায় নেবার চেষ্টা করেন না।

হঠাৎ বুনোর ওই চড়া গলার উত্তরটা মাথায় ঢুকে গেল। আর হেসে উঠলেন জোরে।

বেড়াল কুকুরও কি চা খায় নাকি রে বুনো ?

বুনো সতেজে বলে উঠল, কেন খাবে না ? যার জোটে না সে খায় না। বড় মানুষের পেয়ারের কুকুর, বড়মানুষ গিন্নীর আল্লাদী বেড়াল ডিশে ঢালা চা, চায়ে ভেজা বিস্কুট খায় না চুকচুকিয়ে। নিজের চক্ষে দেকা। বুনো তার এ জেবনে অনেক দেকেচে বাবু, অনেক দেক্‌চে। বেঁচে থাকলে আরো কত দেক্‌বে।

আহা ষাট ষাট বেঁচে থাকবি বৈ কি।

নীহারকণাকে রাগটা হজম করতে হয়, কারণ কর্তা হেসে উঠেছেন। হজম করে ব্যঙ্গ গলায় বলেন, নিশ্চয় থাকবি, একশো বছর পরমায়ু হোক।

অদম্য বুনো চায়ের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বলে, তা সেটা তো 'বাউল্য' বলচো। কে না জানে 'দূর ছাইয়ের' জেবনে ঘুনপোকা লাগে না। ভিক্কের ভাতে প্রেমাই বাড়ে।

তুই তো অনেক জানিস দেখছি—

ব'লে কর্তা আবার 'বাংলা নাট্যমঞ্চের একশো বছরে' ডুবে গেলেন।

নীহারকণা আর একটা কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। বলে উঠলেন,

সে তো হবেই। কথা পড়েই আছে—মেগে খেলে পিত্তি পড়ে না। আর শাস্তরে আছে—পিত্তি না পড়লে পরমায়ু ক্ষয় হয় না।

প্রতীক্ষা অবাক্ হয়ে ভাবে, এই লোকটার সঙ্গেও এতো কথা কয়ে চলতে ইচ্ছে করছে নীহারকণার?

আর ওই যে মানুষটি বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন? ওঁর কেন কখনো ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে না? আবার ভাবল দীর্ঘকালের অভ্যাস। গা সহ্য হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতীক্ষা তো দেখছে চার পাঁচ বছর। প্রতীক্ষার কেন গা সহ্য হয়ে যাচ্ছে না?

বুনো বিরক্ত গলায় বলে ওঠে, কালকের থেকে মা জননী আমার চাডা উই দুয়োর ধারে দিও তো।

নীহারকণা ফস্ করে বলে ওঠেন, কেন? হঠাৎ? দুয়োর ধারের ফরমাস'?

বুনো আরো বিরক্ত গলায় বলে, 'কেন', তা নিজেকে শুদোও।...একটুক চা গলায় ঢালবো, তো অবিরতো কানের কাচে বক্‌বক। মাতার পোকা বের করে দেল। একে তো পাগলের মাতা!

আচ্ছা নীহারকণার তো এতে অপমান হওয়া উচিত ছিল? রীতিমত অপমানই তো করল লোকটা। কিন্তু সেটা মেনে নিলে তো কথা বন্ধ করে ফেলতে হয়। সেটা পারা শক্ত। কথা বন্ধ করে ফেলার ভয়ে নীহারকণা বড় একটা মান অপমান গায়ে মাখেন না।...সাবেকি বাড়িতে কথার চাষ তো যত ছিল, 'কথা বন্ধ'র চাষও তার থেকে কম ছিল না। জায়ে জায়ে ননদে ভাজে, খুড়শাশুড়ী ভাসুরপো বৌতে, থেকে থেকে বেশ কিছুকাল ধরে চলতো ওই 'বাক্যালাপ বন্ধে'র পালা। আবার কোনো এক সময় কী ভাবে মিটেও যেত, আবার হি-হি হাসি, গা ঠেলে কথার আদান প্রদান চলতো।

নীহারকণা কিন্তু বরাবরই প্রথম দলে।

তেজ করে একদিন কথা বন্ধ করলেও, পরদিনই ভুলে গিয়ে কয়ে মরতেন।...পারেন না। এখনো পারলেন না, আবার তো বলে উঠলেন, বড্ড তোর আস্পদ্দা বুনো। যাকে যা না বলবার তাই বলিস। পাগল ছাগল বলে ক্ষ্যামাঘেন্না করি তাই—

বুনোরও সঙ্গে সঙ্গে জবাব, তা তাই কোরো না বাছা! ক্ষ্যামাঘেন্না করে ছাড়ানই ছ্যাও। আমিও বাঁচি, আপনিও বাঁচো। কই গো জন্নুনী, ছ্যাও দিকিন আর একটুক চা! নেশাডা ধরল নি। তবে হাতে আর একচাকা পাঁউরুটিও এনো।

আচ্ছা বুনো—হঠাৎ হেসে ফেলল প্রতীক্ষা! একে সে চুপিচুপি বারণ করে দেবে? বলে উঠল, আচ্ছা বুনো, তোমার রাগ হয় না কেন?

বুনো চোখ কপালে তুলে বললো, হঠাৎ রাগ হতে যাবে ক্যানো? রাগটা বড় সস্তা মাল? তা হঠাৎ এডা মনে এলো যে?

বা, তোমায় কত কী বলা হয়।

হয় তার কী? গায়ে ফোস্কা পড়চে? বুনোর চামড়া গণ্ডারের। বলি তুমি তো আর কিছু বলচো না।

তার মানে সেই 'বলাটাই' ধর্তব্য হবে। নীহারকণার বলাটা নস্যাৎ করতে পারে বুনো।

প্রতীক্ষা শঙ্কিত দৃষ্টিতে নীহারকণার মুখের দিকে তাকায়।

কিন্তু চতুর নীহারকণা একেবারে অন্য লাইনে চলে যান। দিব্যি হ্যা হ্যা হেসে বলে ওঠেন, এই শুনলে তোমার পুতবৌয়ের পুষ্যিপুত্তুরের বাক্যি।

ভুবনবিজয় একশো বছরের ওপার থেকে মাথা তুলে সাড়া দিলেন, শুনলাম বৈকি। ব্যাটা মহা ঘোড়েল।

কিছুই যে তিনি শোনেন নি, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না, শাশুড়ী বৌ কারুরই। সারাজীবন যে তিনি এইভাবেই ঠেকো দিয়ে আসছেন প্রতীক্ষা সেটা এই ক'বছরেই ধরে ফেলেছে। আবার নীহারকণাও হঠাৎ ধরে ফেলেছেন এখন যদি তিনি বুনো সম্পর্কে অধিক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলে বইমুখো মানুষটা ঠিক হেসে উঠে ওই পড়ুয়ে লিখিয়ে মাস্টারনী বৌটির সমর্থনেই রায় দিয়ে বসবে। এবং সেই পৃষ্ঠবলে পাজী বুনোটার আসন আরো পাকা হয়ে যাবে।

যে মানুষ। বললেই হলো, মা আমার বেছে বেছে ভালো একখানা পুষ্যিপুত্তুর করেছেন বটে। আর ওই ব্যাটা ভাগ্যিমানী, সেও একখানা 'জননী' বাগিয়েছে বটে। আহা!

বলতেই পারে। ওই রকমই তো আলগা বুদ্ধি লোকটার। যেন এলো সুতোর বুনুনি। আর বিদ্বেবতী-বৌ পেয়ে আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে আরো যেন বুদ্ধি আলগা হয়ে গেছে।

জ্বালা!

৪

হাওয়া ফেঁসে যাওয়া সাইকেলখানাকে টানতে টানতে, বাস টার্মিনাসের ধারে সাইকেল সারাইয়ের দোকানের সামনে এসেই চমকে উঠল রণু।

লাট্টু দাঁড়িয়ে!

এ দোকানটার গায়েই একটা মফঃস্বল মার্কা স্টেশনারি দোকান, লাট্টুর লক্ষ্যস্থল বোধকরি সেটাই। এই নতুন পাড়ায় এদিকে সেদিকে যেখানে সেখানে, অনেক নতুন নতুন বাড়ি গজিয়ে গেছে বটে, গজিয়ে চলেওছে। 'ছবির মতো' প্রাসাদের মতো, মোটামুটি গেরস্থালী মতোও, তবুও জায়গা-টার মফঃস্বলী মফঃস্বলী চেহারাটা এখনো কাটে নি। দোকানগুলো সম্যক্ সমৃদ্ধ নয়, রাস্তা-টাস্তা প্ল্যানবিহীন, আর এদিক-ওদিক ছোটখাটো দু'-একটা পুকুরও চোখে পড়ে। তা ছাড়া গাছপালাও রয়েছে বিস্তর।···

বহুলোকে যেমন খোদ শহরে ঠাঁই না পেয়ে শহরতলিতে ঠেলে এসে পছন্দ-সই নক্সায় বাড়ি-টাড়ি বানিয়ে গুছিয়ে বসছে, তেমনি আবার বহুলোক ফেলেও রেখেছে একদার জলের দরে কেনা সব জমির প্লট। সেই সব উন্মুক্ত অথবা পাঁচিলঘেরা প্লটের অন্তরলোকে গজিয়ে উঠেছে আগাছার জঙ্গল। এরা সংসারের কিছু কাজে লাগে কিনা আগাছার গবেষণাকারীরা বলতে পারেন, তবে সবুজের সমারোহময় দৃশ্যেরউপস্থাপনা করতে পারে। যাতে চোখটা ঠাণ্ডা না হয়ে পারে না।

আগাছারা যেন বেশী ঘন, বেশী সবুজ।

রণুর অন্তত হঠাৎ তাই মনে হচ্ছিল, সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আন-বার সময়। ঠিক এভাবে বোধহয় তাকিয়ে দেখে না কোনোদিন। বাড়ি থেকে বেরোতে হলেই প্রায়শই সাইকেলখানার সওয়ারি হয়ে বোঁ করে

বেরিয়ে পড়ে।

ঠিক এখানটায় অবশ্য তেমন সবুজের ছড়াছড়ি নেই।

টার্মিনাসের বিরাট চত্বরটার মধ্যে ছুটো কিসের যেন উঁচু উঁচু বিশাল বিশাল গাছ আছে, আর এই সাইকেল সারাইয়ের দোকানটার ঠিক পিছনেই রয়েছে একটা অশ্বত্থ গাছ। যারা সবুজটা নিয়ে অনেক উঁচুতে বিছিয়ে বসেছে। অশ্বত্থ গাছ কাটা চলে না, তাই সেটিকে সুরক্ষিত রেখেই দোকান-ঘর বানিয়ে নিতে হয়েছে দোকানীকে। চালাঘর, তার পিছনের দেওয়ালের খানিকটা মজবুত করেছে গাছের গুঁড়িটা।·· সাইকেলগুলো ওর গায়ে এবং ওর কাছে ঠেস দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখে দোকানওলা নবনীধর।···নবনীধর বিশ্বাস।

যার জন্যে দোকানটার নড়বড়ে গায়ে ঝোলানো টাঙানো টিনের সাইন-বোর্ডটায় লেখা আছে, 'প্রোপাইটার এন্ ডি বিশ্বাস।' সাইকেল সারাই ও পাম্প করা হয়।

রণু যখনি বাসে চড়তে আসে সাইকেলটাকে এখানে জমা দিয়ে রেখে টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে গিয়ে উঠে পড়ে। সবসময় খুব যে একটা লাভ হয় তা নয়, লোকসংখ্যার প্রাচুর্য এখানে অবিশ্বাস্য। এবং এই বুদ্ধিটাও অনেকেরই মগজে খেলে। বাস টার্মিনাসে ঢোকার আগেই পথ থেকে উঠে সিট্ নিয়ে বসে পড়ে। তবুও মাঝে মাঝে বসবার জায়গা জোটে। অতঃপর বাসে চড়ে নিজেদের বাড়িটা দেখতে দেখতে চলে যায় রণু।

মা বলে, এতো অধৈর্য কেন ? ছু'চার মিনিট অপেক্ষা করলেই তো বাড়ির সামনে থেকেই পেয়ে যেতিস।

রণু বলে, অপেক্ষার ছু'চার মিনিট, অনন্ত কালের মতো নীহারকণা দেবী। ধৈর্য থাকে না।

রণুর কথার ধরনই এই। ছোট থেকেই ওদের পুরনো বাড়ির সনাতনী শিক্ষা সহবৎ রণুকে কব্জা করতে পারে নি। সেখানে, ওই বৃহৎ পরিবারে রণু ছাড়া অন্য আর কেউ ভাবতেও পারবে না, মাকে এই ভাবে নাম করে সম্বোধন করা যায়। ওর দাদা তো এখনো অবাক্ হয় ভাইয়ের বেপরোয়া বাক্য বিন্যাসে।

লাট্টুকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠল রণু।

তুই এখানে ?

লাট্টু বললো, আসতে নেই ?

লাট্টুর চোখে যেন এখনি দেখা ঘন সবুজের ছোঁয়া। লাট্টুর লম্বা ছাঁদের টানটান শরীরে হাল্কা বাসন্তী রঙা শাড়িটাও টানটান করে পরা। আর লাট্টুর মুখের গড়নটা তো মাজা-ঘসা চাঁচা-ছোলাই। তবু আজ যেন বেশী মাজা আর তাজা দেখাচ্ছে।...কেন ? কী করেছে ও ?

রণু বললো, দারুণ ফ্রেশ আর স্মার্ট দেখাচ্ছে তোকে। কেন বল তো ?

লাট্টু অন্য দিকে চেয়ে বললো, খোঁপা বেঁধেছি বলে বোধহয়।

খোঁপা। মানে চুল তো ? কেন বাঁধিস না তুই ?

খোঁপা বাঁধি ? দেখেছ কোনোদিন ?

রণু অসহায়ভাবে বলে, ওভাবে জিগ্যেস করলে ঘাবড়ে যাব। দেখেছি কি দেখি নি মনে পড়ছে না।

আর মনে পড়াতে হবে না।

রণুও আর চেষ্টা করল না। যদিও তার মনে হলো বোধহয় দেখে নি। মুখের দু'পাশে দুটো মোট্কা মোট্কা বেণী ঝুলে থাকতেই দেখেছে। অথবা পিঠটা জুড়ে একগাদা খোলা চুল।

কিন্তু ওই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দায় ? ওকে যে খুব তাজা চিকন আর সতেজ দেখাচ্ছে সেটাই সুখের।...একটু আগে রণু পথের ধারে কিছু আগাছার ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে সকলের মাথা-তুলে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লম্বা ছাঁদের সতেজ গাছ দেখেছিল, তার উজ্জ্বল সবুজ পাতাগুলো বাতাসে তিরতির করছিল। লাট্টুকে হঠাৎ সেই গাছটার মতো মনে হলো রণুর। ওরও চোখের পাতা দুটো যেন তিরতির করছে।

শুধু দু'খানাই পাতা।

তবু অনেক।

কিন্তু আসল কথাটারই তো উত্তর দিলি না। এখানে কোথায় এসেছিলি ?

আসি নি, যাচ্ছি।

যাচ্ছিস ! তা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

দাঁড়িয়ে থাকব কেন ? টফি কিনছি।

কিনছিস ? দিচ্ছে কে ?

কিনবো মনে করছি। দেবে ঠিকই।

সর্বনাশ ! তুই তো দেখছি মানুষ খুন করতে পারিস।

তার মানে ?

মানে তোর কাকার সেই অভিজাত পাড়া থেকে এতো মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে এসেছিস এই হতভাগা পাড়ার এই লক্ষ্মীছাড়া দোকানে দুটো টফি কিনতে ! মানুষ খুনের কাছাকাছিই বলা চলে না ?

লাট্টু ঘাড়টা ঈষৎ ফিরিয়ে বললো, তা হলে তাই।

রণু হঠাৎ অবাক্ হলো। লাট্টুর ঘাড়টা কি ইহজন্মে দেখে নি রণু ? এমন নতুন লাগছে কেন ? এত ফর্সা ওর ঘাড়টা ? আর এতো সুন্দর গড়ন ? ঘাড়ের জন্যেই বোধহয় চেহারাটায় এমন লম্বা ছাঁদ এনে দিয়েছে।··· লাট্টুর গলায় হার-টারের বালাই নেই।···আজকাল ছিনতাইয়ের ভয়ে মেয়েরা সোনার গহনা না পরলেও, 'কিছু না কিছু' না পরে তো ছাড়ে না। কাঁচ পাথর রুপো স্টীল, দস্তা পিতল। হার তো একটা চাইই দেখা যায়। পরিস্থিতির কাছে হার মানতে তো রাজী নয় কোনো মেয়ে। লাট্টুই দেখছি হারের ধার ধারে নি।···

কিন্তু আগে তো ছিল মনে হচ্ছে।

কিংবা ছিল না।

এসব ব্যাপারে রণুর স্মৃতিশক্তি হাস্যকর রকমের দুর্বল। তবু মনে হলো, ছিল নিশ্চয়। এখন নেই। না হলে মনে হচ্ছে কেন, লাট্টুর ওই লম্বা ছাঁদের মাজা মাজা মসৃণ অবাধ নির্মল ঘাড়টা এই প্রথম দেখল।

আর ঠকতে রাজী নয় বলে রণু ও কথায় গেল না। বললো, রেগে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে।

তুমিই রাগাচ্ছো। চিরকাল জানো বাসে উঠলে আমার গলা শুকোয়—টফি লজেন্স খেতে হয় ?

জানি না আবার ?

রণু হেসে ফেলল, সেবার সেই ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে কী বিপদে ফেলেছিলি।

সেই কথাটাই খুব মনে আছে কেমন ?

নাঃ আজ দেখছি লড়াকু মনোভাব নিয়ে বেরিয়েছিস। তা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতটা হবে ? চ' বাড়ি যাই। সাইকেল থাক।

কে বললো, তোমাদের বাড়ি যাবার জন্যে এসেছি ?

রণু অবলীলায় বললো, এমনি ভাবলাম। এ পাড়ায় যে তোর আরো চেনা জানা বাড়ি আছে জানি না তো।

লাট্টু চড়া গলায় বললো, দেখো রণুদা, যেখানে যাচ্ছিলে যাও ভাগো। আমার সঙ্গে তোমায় সৌজন্য করতে হবে না। আমার যেখানে খুশী আমি যাবো।

রণু উদাস গলায় বললো, এতে আর আমার কী বলার আছে ? তবে, যদি কোনোদিন বাবা বা বৌদি টের পায়, তুই এ পাড়ায় এসেছিলি, অথচ 'লীলা-ধামে' যাস নি খুব দুঃখ করবে।

শুধু বাবা আর বৌদি ?

আর কারো কথা তো মনে পড়ছে না।

রণুদা, তুমি আমার সামনে থেকে যাবে কিনা ? যে রকম রাগিয়ে দিচ্ছ, ফিরতি বাসে ফিরে যেতেও পারি।

অবিশ্বাস করছি না। মেয়েরা কী না পারে ? কিন্তু হিতকথা যদি শুনিস তো বলি—গোটা কতক টফি অন্তত সঙ্গে নে। ফের গলা শুকোবে।

বলে সাইকেলটা নিয়ে দোকানের মধ্যে ঢোকে।

মালিক ছিল না, ছিল সেই হাড়বোকা ছেলেটা, যাকে মালিক বলে ভাগ্নে, খাটায় চাকরের অধম।

রণু বললো, মামা নেই ?

নাঃ। আমায় বোস করিয়ে রেকে চলে গেল।

বেশ করল। এলে বলিস, আমি দিয়ে গেছি, হাওয়া দিতে হবে।

আজ্ঞে কী নাম বলব ?

রণু কড়া গলায় বলে, আমার নাম জানিস না তুই ?

জানিঃ ! রণু দাদাবাবু।···তো মামা যে বলে, যে আসবে তাকে নাম-ধাম শুদোবি। তাই—

ঠিক আছে। বলিস্ নাম। আর ধাম ? বললে মনে থাকবে ? 'লীলাধাম।'
লীলাধামের রণুবাবু। মনে থাকবে ?
খুব মনে থাকবে। লীলাধাম তো ?
ও দোকান থেকে বেরিয়ে এ দোকান থেকে একমুঠো টফি কিনে লাট্টুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, চল।
লাট্টু বললো, সবগুলো আমায় দিলে যে বড় ? এ তো ভালো নয়।
আহা, তোর দাতব্যের দানই না হয় খাওয়া যাবে দুটো।
লাট্টু হাতের মুঠো খুলে ক'টা ওকে দিলো, আর একে একে দুটোর মোড়ক খুলল, তার থেকে একটা রণুর দিকে বাড়িয়ে ধরে একটা নিজে মুখে পুরল। তারপর রণুর সঙ্গে পা চালাল।

চলতে চলতে রণু বললো, যাচ্ছিলি যে, বাড়ি চিনে বার করতে পারতিস ?
লাট্টু অবহেলায় বললো, ঠিকানা জানা থাকলে বিলেত আমেরিকায়ও ঘুরে আসতে পারা যায়।
বিলেত আমেরিকা ? সে তো অন্ধের হাতে ঠিকানা ধরিয়ে দিলেও যেতে পারে। কিন্তু কলকাতার এই শহরতলিতে ? বারোর বাষট্টি খুঁজে বার করতে তোর ঘাম ছুটে যেত। এমন বিশ্রী ব্যাপার ! এগারোর পরের বাড়িটাই হয়তো সাতাশী।
কেন, 'লীলাধাম' বললে লোকে দেখিয়ে দিত না ?
ক্ষেপেছিস ? কে কার কড়ি ধারে ? এর তো আবার 'ঈস্ট' আছে 'ওয়েস্ট' আছে। হাড়ে হলুদ হয়ে যেত। তাও পেতিস কিনা সন্দেহ। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।
লাট্টু ঝেঁজে উঠে বললো, বাস থেকে নেমেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, আর তুমি পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে, এই আশায় বেরিয়েছি, এতোটা না ভাবলেও পারতে !
রণু বললো, সেটাই কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করছে, রণুর গলার স্বরটা গভীর গভীর লাগল, তোকে দেখেই মনে হলো বাস থেকে নেমে তুই যেন আমার অপেক্ষাতেই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছিস।

লাট্টু কি গভীরতাকে ভয় করে ?

তাই আচমকা হি-হি করে হেসে উঠে বললো, তোমার অপেক্ষায় ? আর কিছু না ? আমি স্রেফ একটা কালো-কোলো গাঁট্টাগোঁট্টা রিক্‌শওয়ালার অপেক্ষায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, বুঝলে ?

মেয়েরা এই রকমই নিষ্ঠুর নরাধম হয়। ছিঃ। বানিয়ে বানিয়েও কিছু বলতে জানে না। ঠিক আছে রিক্‌শ চড়তে চাস তো তাই বল। দেখি একটা।

এখন আর চাইছি না।' 'লীলাধাম' আবিষ্কারের জন্যে চাইছিলাম···তোমরা কিন্তু বেশ খোলামেলায় চলে আসতে পেরেছ রণুদা। নতুন মামা, হৃদয়দা ওরা দু'জনে যা এক-একখানা ফ্ল্যাট কিনে বসেছে, উঃ! সামনেটা ছাড়া কোথাও আলো-হাওয়ার ব্যাপার নেই। একটা ম্যানসনে একশো বত্রিশটা ফ্ল্যাট। যারা মাঝখানে পড়ে গেছে, তাদের কী অবস্থা ভাবো।

কী করবে ? বৌ নয় তো যে যত ইচ্ছে রিজেক্ট করে করে ইচ্ছেমত একটা বেছে নেওয়া যায়। এ বাবা লটারিতে যার যেখানে নাম উঠবে।

লাট্টু বিদ্রূপের গলায় বলে উঠল, তুলনাটা ভালই দিলে। তোমাদেরই উপযুক্ত। ভাবা যায় না।

ভাবা যায় না ? কী ভাবা যায় না ?

রণু অবাক হলো।

এই মনোভাব নিয়ে তোমরা প্রেমসে প্রেম করে যাও।

সত্যের অপলাপ করিস না লাট্টু। ফাটাকাটি হয়ে যাবে।···আমিই বলে—

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে।···বেরিয়েছিলে কী জন্যে ?

জানি না। মনে নেই।

আচ্ছা, রণুদা। আমরা সবসময় ঝগড়া করি কেন ?

নিজেকে জিগ্যেস কর। সেই পেনি পরার কাল থেকে ঝগড়াটা তুইই বাধিয়ে আসছিস কিনা।

কক্ষনো না। সাক্ষী নাও তো ও-বাড়ির সবাইয়ের কাছে। বলুক কেউ ঝগড়া করেছি কারুর সঙ্গে ?

আমার ব্যাপারেও তাই।

অথচ তুমি আমি একত্র হলেই—আশ্চর্য!

জন্মলগ্নের কারসাজি না কি বলে, বোধহয় তাই।

বলেই রণু দাঁড়িয়ে পড়ে চট করে লাট্টুর কাঁধটায় একটু হাত ঠেকিয়ে নিচু গলায় বলে, এই লাট্টু, রাস্তায় কোনো চেনা লোক দেখেছিস?

চেনা লোক? না তো?

তাহলে 'লীলাধামে' না গেলেই বা কী হয়?

লাট্টুও দাঁড়িয়ে পড়েছে। চোখ তুলে চুপ করে।

লাট্টুর চোখে সদ্য সকালের আকাশের মতো টলটলে আলো, না গেলে মানে?

রণু বললো, এই টার্মিনাসটা থেকে কত দিকে যাওয়া যায়। ধর, চলে গেলাম 'তারাতলা'। চলে গেলাম 'আদি গোবিন্দপুর,' নিদেন 'বোড়াল' 'হরিনাভি' 'চিংড়িপোতা—

লাট্টু তেমনি চোখে তাকিয়ে বললো, গিয়ে?

গিয়ে আবার কি? গল্প করা যাবে, দীনহীন একটা চায়ের দোকানের ভাঙা বেঞ্চে বসে চা খাওয়া যাবে, রাস্তায় যেতে যেতে গান গেয়ে ওঠা যাবে—

লাট্টু বললো, তাতেই বা কী হলো?

রণু বললো, সাধে আর বলেছিলাম, তোরা মেয়েরা দারুণ নরাধম।

সবাই নয়।

লাট্টু গম্ভীর হলো, এমন অনেক মেয়ে আছে যারা এরকম অফার পেলে আহ্লাদে গলে যায়।

তার মানে তুই স্পেশাল নরাধম।···কিন্তু একটা দিন একটু হৃদয়বতী হ'না বাবা! তা ছাড়া তোর সঙ্গে একটা সময়সাপেক্ষ আলোচনা করার দরকার। তোকে দেখে এতো ইয়ে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আজই একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলা যাক।

আস্তে আস্তে ওরা বাসের টার্মিনাসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল আবার। যেন অজ্ঞাতসারে।

অ-চেতনায়।

তবু কথায় ছুরির ধার লাট্টুর, আচ্ছা খুব হয়েছে। তবু যদি না চিনে ফেলতাম তোমায়। এই অ্যাতো দিনের মধ্যে দেখা করতেও তো গেলে না একদিন।

দেখা করতে? তোর সেই নাকউঁচু কাকার 'পশ' এলাকায়? কুকুরওলা বাড়িতে? সর্বনাশ!

কাকার কুকুর খুব ট্রেনড্। কাউকে কিছু বলে না।

তা জানি। বড়লোকের কুকুর তাই হয়, তবে লোক দেখলেই ঠিক চিনতে পারে—লোকটা কোন্ দরের। সেই মতো ট্রিটমেন্ট করে।

তোমার সবই বাড়াবাড়ি। কই মাকে আমাকে তো কিছু করে না?

বললাম তো জাত চিনতে পারে ওরা।

লাট্টু রণুর নির্দেশিত বাসটায় উঠে পড়ে বলে, আমরা কি ছোট কাকার 'জাত?'

সবটা না শুনে কোনো রিমার্ক পাশ করতে চাই না। চল যেতে যেতে তোর এতো দিনের এক্সপিরিয়েন্সের কাহিনী শুনি।

নতুন কিছুই না রণুদা। শুধু স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে।

চল যেতে যেতে শুনি। বিবো পিসী আমাদের কথা বলে?

তোমাদের বিবো পিসীর তোমরা ছাড়া আর কোনো জগৎ আছে?

বাসটা একদম খালি।

এখনো একটাও লোক ওঠে নি।

ইচ্ছে মতন জানলার ধারে বসল ওরা।

কাছাকাছি।

লাট্টু বলল, যা নয় তাই করে বসলে রণুদা, আমিও কেমন বোকার মতন তোমার অনুসরণ করে চলে এলাম! এখন দারুণ ভয় করছে।

ভয় কিসের, তা তো বুঝছি না। রাত তো নয়।

কিন্তু কখন ফেরা যাবে জানি না তো।

'লীলাধাম' থেকে 'সৌজন্য দিবস' পালন করে যতক্ষণে যেতে পারতিস,

তার বেশী নয়।

তারপর? মা যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লীলাধামের খবর জানতে চাইবে?

তোকে কিছু বলতে হবে না। আমি বলব। যাব তো তোর সঙ্গে।

তুমি যাবে?

লাট্টু মান-অভিমান ভুলে ওর হাতটা চেপে ধরে।

রণু সেই হাতটার উপর নিজের আর একটা হাত রেখে বলে, উপায় কী? তোকে তো আর একা সেই ঝড়ের মুখে ছেড়ে দিতে পারি না। যা ম্যানেজ করবার আমিই করব। তবে তোর ওই নাকউঁচু কাকার 'নিরীহ' কুকুরটিকে সামলাবার ভার নিতে হবে তোকে।

অনায়াসে। সে এখন আমায় খুব চিনে ফেলেছে।

খুবই স্বাভাবিক। মানুষ চেনা সম্পর্কে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী ওরা। দেবতারাও যাদের অনন্তকালেও চিনে উঠতে পারে না ওরা দু'দিনেই তাকে চিনে ফেলে। এমন কি হয়তো ভালবেসেও ফেলে।

ফেলেই তো। মানুষের মতো অকৃতজ্ঞ নয় ওরা।

ঝাঁজের সঙ্গে বললো লাট্টু।

রণু খুব নিরীহ গলায় বললো, একটা ওয়ার্ড মিসিং। বল্ 'মেয়ে' মানুষের মতো।

ফের রণুদা! বাস থেকে নেমে যাব বলছি।

নেমে পড়। একটা নাটকীয় দৃশ্য দেখতে পেলে ধন্য হয়ে যাবে এই অভাগা মফঃস্বলবাসীরা।

লাট্টু বললো, উঃ! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম!

সাবেকি বাড়ির বড় সংসারে মানুষ হওয়া মেয়ে, গিন্নীদের মতো কথা শিখে রেখেছে অনেক।

লাট্টু জানলার ধারে। রণু পাশে। গাড়িতে এখনো কেউ ওঠে নি। কিন্তু জানলার ধারে বাইরে লোক ঘোরাঘুরি করছে। তবু দুঃসাহসে ভর করে রণু চট করে ওর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো, মনে মনে তো ভাবছিস, 'তার মুখ দেখেই যেন রোজ উঠি।'

নিজের সম্পর্কে একটু 'ওভার এস্টিমেট' হয়ে যাচ্ছে না রণুদা?

আমি তো উল্‌টোটাই ভাবছি।

একটি একটি করে লোক উঠছে। জানলার ধার দখলকারীদের প্রতি ঈর্ষাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে করে বসে যাচ্ছে। অবশ্য জানলা একটা নয় এই সুবিধে।

এরা নিশ্চিন্ত।

'আদি গোবিন্দপুরের' যাত্রীদের মধ্যে চেনা লোক বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

৫

বৃহৎ একটা বটগাছ ছিল, ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে অনেকটা জায়গা দখল করে ফেলেছিল, তার খাঁজে খাঁজে ছিল অনেক পাখির আশ্রয়স্থল। গাছটা ভেঙে পড়ায় বাসা ভেঙেছে অনেকের, আশ্রয়চ্যুত হয়েছে কেউ কেউ। এদের আর নতুন বাসা বাঁধার ক্ষমতা নেই, আবার কোথাও গিয়ে উঠতে হয়েছে পরগাছার মতো।

বিভা তাদের মধ্যে একজন।

একটা মাত্র ছোট্ট মেয়ে নিয়ে বিধবা হওয়া বিভা, মামার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। অথবা বলা যায় দাদুর বাড়ি। বিজয়গুষ্ঠীর তদানীন্তন কর্তা জগৎবিজয় চৌধুরী ছিলেন বিভার মায়ের কাকা। মৃতা ভাইঝির বিধবা মেয়েকে স্নেহে সমাদরে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়াটাকে তিনি খুব একখানা মহৎ কর্ম করছি বলে ভাবেন নি, সাধারণ কর্তব্য হিসেবে নিয়েছিলেন।

অতএব বিভা ভবানীপুরের ওই 'বিজয়' কোম্পানির একজন হয়েই রয়ে গিয়েছিল। এই থাকাটা যে তার অধিকারহীন থাকা—তা সে নিজেও মনে করত না, অন্যরাও ভুলে গিয়েছিল।

তার মেয়ে অনিন্দিতা, ডাকনাম যার লাট্টু, সে ওই সমগ্র সংসারের সদস্যকুলের মধ্যে বিশেষ একটি সদস্যরূপেই বিরাজিত থেকেছে। এই 'বিশেষ'টা তার ডাকনামেই প্রকাশিত। অতবড় বাড়িখানায় এসে পড়ে সেই বছর

দেড়েকের মেয়েটা নাকি লাট্টুর মতো পাক খেয়ে বেড়াত সর্বত্র।

মায়ের মতো অতোটা রঙ পায় নি লাট্টু, তবে মুখশ্রী পেয়েছে। তার উপর নিজের অর্জিত বুদ্ধির লাবণ্য, বিদ্যার স্থির আভা। মোটের মাথায় বাড়ির যারা আদত মেয়ে, জন্মসূত্রে অধিকারিণী, তারা কেউই ঠিক লাট্টুর মতো নয়। মানে লাট্টুর মতো সর্বজন মনোহারিণী।

তাদের ওয়ারিশান আছে। তারা সেইখানেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। লাট্টুর তা নেই, এইটা একটা বড় সুবিধে, তাই সকলের মুখেই লাট্টু লাট্টু। ...অবশ্যই ফরমাশ করতে, কাজ বাগাতে।

কিন্তু লাট্টু তাতে বেজার হতো না। লাট্টুর সব কাজেই সমান উৎসাহ। বিভাও যে বিরূপ হতো তা নয়। বরং তার মেয়ে যে বাড়ির সকলেরই প্রিয়, সাপের এবং নেউলের, আদার এবং কাঁচকলার, সমান স্নেহভাজিনী, এতে বিভার নিশ্চিন্ততাই ছিল।

লাট্টু ওই সেকেলে ধাঁচের মস্ত বাড়িটার সর্বত্রই আছে। কাজেই কখন কোন্ ছেলেটার সঙ্গে বেশী কথা বলছে, অথবা তার সঙ্গে কখন ঝগড়া বাধাচ্ছে, কারুর চোখে পড়ত না।

আর বিভা? যার চোখ রাখা উচিত, সে তো সারাক্ষণই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। কোথায় মা, কোথায় মেয়ে, শুধু রাত্রে শোবার সময়। তাও তো বেশির ভাগ দিনই মা এতো রাত্রে শুতে আসতো যে মেয়ে হয়তো ঘুমিয়েই পড়তো। আবার ইদানীং মেয়ে বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত রাত জেগে পড়াশুনো করতো মেয়ে, তখন তার সঙ্গে গল্প করা চলে না।

রাত জেগেই পড়া লাট্টুর।

সারাদিন তো তাকে কেউ বই ছুঁতেই দেখত না। বা পেত না।

তবু ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে সমান ভাবেই পরীক্ষা সাগর সাঁতরে সাঁতরে কূলে উঠেছে 'লাট্টু'। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হবো হবো করছিল, এহেন সময় ওই বাসাটা ভাঙল। বাড়ির খোদ মালিকরা যে যার আলাদা বাসা বেঁধে নিল।

তলে তলে গোছগাছ চলছিল অনেক দিন ধরেই, কিন্তু বিভা আর তার মেয়ে সম্পর্কে, হারাধন কাকা আর সুশীলাবালার সম্পর্কে কোনো আলো-

চনা হয় নি। যেন ওই আলোচনাটা একটা সাপের বাসা, কে খোঁচা দিয়ে পাড়তে যাবে বাবা! যে উদ্যোগী হয়ে দরদ দেখাতে আসবে, তার উপরই যদি ছোবলটা এসে পড়ে।

বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার পরও যে মাসতিনেক মেয়াদ ছিল, তার মধ্যেই সবাই একে একে পাততাড়ি গুটোচ্ছে দেখে বুড়ো হারাধন কাকা একদিন একটা সমবেত সভায় এসে কেঁদে পড়ল। সমবেত সভার অভাব ছিল না দৃশ্যতঃ কেউ তো ঝগড়া-ঝাঁটি করে ভিন্ন হচ্ছে না? শুধু আধুনিক জীবনের সুখ সুবিধেগুলো পাবার জন্যে স্বাধীনভাবে একক কর্তৃত্বের স্বাদ-পাবার জন্যে সকলে মিলে কুড়ুল বাগিয়ে পুরনো বটের গোড়ায় কোপ মেরেছে।

হারাধন কাকা যে কার কাকা তা সকলের জানা নেই। সবাই ওই একই নামে ডাকে। তবে ইতিহাস উল্টে দেখলে দেখা যায় তিনি বর্তমানের এই 'বিজয়' কোম্পানির মা লীলাবতীর কাকা। যে লীলাবতীর নামে ভুবনবিজয়ের 'লীলাধাম'।

লীলাবতী বহুকাল আগেই লীলা সংবরণ করে চলে গেছেন, কিন্তু প্রায় সমবয়সী এই অনাথ কাকাটিকে এদের দয়াতেই ফেলে রেখে গিয়েছিলেন। তা' খুব একটা খারাপ অবস্থাতেও ছিলেন না কাকা এ-যাবত। বৌরা জানতো হারাধন কাকার জন্যে দু' কুনকে চাল বার করতে হয়, বামুনঠাকুরকে বলে রাখতে হয়, যেন বড় জামবাটির একবাটি ডাল তাঁর জন্যে রাখা হয়, এবং অন্যবিধ উপকরণ যাই হোক, মোটা চচ্চড়িটা যেন মোটা ওজনে তাঁর পাতে দেওয়া হয়।

রাত্রেও রুটির গোছাটা তাঁর পৃথক মোটাসোটা। পাতলা পাতলা 'বাবু-রুটি' দু' চক্ষে দেখতে পারেন না হারাধন।

কালক্রমে ঘরে ঘরে আলাদা হাঁড়ি বসলেও, অন্তরালে একটা 'চাঁদার' ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। যেটা হারাধন ঠিক ঠাহর করতে পারতেন না। ···পাঁচজনের রান্নাঘর থেকে একটু একটু চাঁদায় তাঁরটা সমানই হয়ে যেত। গিন্নীদের ছেলের বৌরা অথবা বড় বড় মেয়েরা আড়ালে হেসে হেসে বলতো, 'বকরাক্ষসের ভোগ গোছানো হচ্ছে।'

পুরুষদের কানে অবশ্য উঠত না এ ব্যবস্থার খবর। শুধু হারাধন মাঝে মাঝে খেতে বসে ভাঙাভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করতেন, অ মেজবৌমা, অ ছোটবৌমা অ নাতবৌ, ডালটা কিসের বল তো ? একবার মনে হচ্ছে অড়রডাল খাচ্ছি, একবার মনে হচ্ছে বিউলিডাল খাচ্ছি, নাকি মুসুরিডাল খাচ্ছি।

নাতবৌরা থাকলে হেসে হেসে বলতো, বুড়ো হলে অমন অনেক রকম মনে হয় হারাধন কাকা।

হারাধনের চোখে ছানি পড়েছে আর কানের পর্দাটা একটু মোটা হয়ে গিয়েছে বলে কি সত্যিই সমস্ত বোধশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল ? তবু তিনি যেন অবিশ্বাস্য সত্যটাকে যাচাই করতে চেষ্টা করতেন। তবু সন্দেহটা ব্যক্ত করে ফেলে পায়ের তলার আলগা মাটিটুকুও হারাতে চাইতেন না।

তবু মাটিটা সরল।

৬

হারাধন তাঁর শীর্ণ শিরাবহুল দড়ি পাকানো চেহারাখানা নিয়ে আছড়ে এসে পড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে উঠলেন, তোমরা তো যে যার রাস্তা দেখছ। এই বুড়োর কী ব্যবস্থা করছ ?

কর্তারা অনেক দিনই ওঁকে চোখে দেখেন নি, নিচের তলায় সিঁড়ির পাশের অন্ধকার অন্ধকার ছোট্ট ঘরটাতেই উনি দিবারাত্রি কাটান। সেই ঘরের সামনের প্যাসেজেই তাঁর ভাত ধরে দেওয়া হয়।

তবে নিন্দে কেউ করতে পারবে না গিন্নীদের।

শেষ দিন পর্যন্ত আসন পেতে ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে হারাধনের। জলের গ্লাস পাতের পাশে একটুকরো লেবু আর নুন, তারও ব্যতিক্রম ঘটে নি। বড় সংসারের এই একটা মজা আছে, চক্ষুলজ্জাহীন ভাবে খুব দুর্ব্যবহার করতে পারে না কেউ কারুর সঙ্গে। অনেকগুলো চোখকে অগ্রাহ্য করা শক্ত।

হারাধনকে যে আস্তে আস্তে বাড়ির চাকরের ঘরটায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাতেও একটা মলাট দেওয়া হয়েছে।

'বুড়োমানুষ! রাতে একটা লোক ঘরে থাকা ভালো। কী জানি যদি পড়ে-টড়ে যান।'

আর সেই লোক কে হবে? চির পুরাতন 'নবীন' ছাড়া?

নবীন শেষ দিন পর্যন্তই ছিল। বাড়িটা ঝাড়া-মোছার ভার ছিল তার উপর। তার মাইনেটা, বাড়ির ট্যাক্স ইলেকট্রিক বিলের মতো 'ফাণ্ড' থেকে জোগানো হতো। এবং যে যখন নিজস্ব কাজ করিয়ে নিতো আলাদা বকসিস দিয়ে দিতো। বদান্যতায় কে কত বেশী তার উদাহরণ দেখাতে হয়তো কাজের তুলনায় অনেক বেশীই দেওয়া হয়ে যেত।

এদের রান্নাঘর আলাদা হয়ে পর্যন্ত নবীন বড় সুখে ছিল। অবশেষে তাকে মেজগিন্নী নিয়ে নিলেন। মেজবাবুর সঙ্গে সে বেলেঘাটার ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠেছে।

রাতে নবীনকেই ডেকে ডেকে শুধোতেন হারাধন, হ্যাঁরে আমার কী ব্যবস্থা হবে কেউ কিছু বলে?

নবীন অনায়াসে বলতো। আমি নোকর-নফর মানুষ, আমায় কে কি বলতে যাবে?

তোকে তো মেজবাবু নিচ্ছে।

নিচ্চেন কি না নিচ্চেন তিনিই জানেন। খাতায় কলমে তো লিকে ত্থান নি।

অতএব হারাধনকে নিজেই দরবারে গিয়ে দাঁড়াতে হলো।

কর্তারা তাকিয়ে দেখে প্রথম যা দেখে অবাক্ হলেন, তা হলো হারাধনের ওই দড়ি পাকানো চেহারাটার মধ্যে অবস্থিত পেটটা। পিঠের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া ওই পেটটায় শুধু দড়া দড়া কিছু শিরা আর কোঁচকানো কোঁচকানো খানিকটা চামড়া ছাড়া তো কোনো গঠন ভঙ্গিই নেই। এই পেটে উনি তিনজন জোয়ান লোকের খাদ্য ঢোকান?

কথাটা কি করে বিশ্বাস করা যায়?

অথচ সব থেকে 'বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান' থেকেই তো শোনা। সকলেরই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান।

মেজ নিখিলবিজয়ই একটু বেশী মুখফোঁড়, তিনি বলে উঠলেন, তা আমরা তো সকলেই ছোট ছোট ফ্ল্যাট কিনে কি দু' তিন খানা ঘরের বাড়ি করে চলে যাচ্ছি, ব্যবস্থার কথা কি করে বলি ?

তোমাদের এখানে আমি এই বাহান্ন বছরকাল রয়েছি, এখন তোমরা আমায় এই ভাবে ঝেড়ে জবাব দিচ্ছো ?

হারাধন প্রায় কেঁদে উঠে বললেন, তেরাশী বছর পার করেছি, আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো বাবা ? বাকি ক'টা দিনের ভার একজন কেউ নাও ?

একজন ?

কিন্তু সেটি কোন্ জন ?

কে মহানুভবতায় এগিয়ে এসে বলবে, 'আমিই সেইজন !'

এই সব আপদ বালাইয়ের জন্যেই তো আরো জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

কর্তাদের ছেলেরা তখন কেউ উপস্থিত ছিল, কেউ ছিল না, যারা ছিল তারা ঘর থেকে বেরোল না।

যিনি নেতৃত্ব নিয়েছেন, তিনিই নির্লিপ্ত গলায় বললেন, জীবন মরণের কথা কি কিছু বলা যায়? আপনার দিন ফুরোবার আগেই আমার দিন ফুরোতে পারে। ছেলেদের ঘাড়ে একটা ভার চাপিয়ে যাওয়া উচিত কি ?

সেজ ভুবনবিজয় ঘরে উঠে এসে নীহারকণাকে শুধোলেন, কী করা যায় বল তো ?

নীহারকণা জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বললেন, যা ইচ্ছে কর। আমায় জিগ্যেস করতে এসেছ কেন ? কাউর টনক নড়ল না, তোমারই বা কিসের মাথা ব্যথা ?

কথাটা সত্যি।

কেউ তো নড়ছে না। তার মানে কারুরই টনক নড়ে নি। অতএব ভুবনবিজয় আবার একধারে এসে বসলেন চোরের মতো।

নীহারকণা মনে মনে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। ভাগ্যিস আকাশ-

চোখো বৌটিকে এই সময় দু' মাসের জন্মে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে রেখেছি। তিনি থাকলে, শ্বশুর-বৌয়ের উদারতায় কী না কি হয়ে বসতো কে জানে।...পাঠিয়েছিলেন অবশ্য অন্য চিন্তায়। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় সাবেকি বাসনকোসন আসবাবপত্তর নিয়ে ন্যায্য ভাগাভাগির প্রশ্ন উঠবে, সেক্ষেত্রে ওই বৌটি উপস্থিত না থাকাই ভালো। থাকলেই হয়তো বলে বসবে, 'আমাদের এতো কি দরকার মা?'...অথবা 'অতটুকু বাড়িতে এসব কোথায় ধরবে মা?'

নীহারকণা অবশ্যই এমন বোকাটে প্রশ্নে গলবেন না। তবে তিনি 'ন্যায্য' নিয়ে লড়ালড়ি করলে বিদ্যেবতী হয় তো মনে মনে শাশুড়ীকে ঘেন্না অবজ্ঞা করবে তার থেকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে রাখাই শ্রেয়ঃ।

নীহারকণার দেখাদেখি আর দুজনও তাই করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এতো-দিনের জায়গা ছেড়ে যেতে বাচ্চাকাচ্চাদের মন খারাপ হবে। তারা যে একে-বারে নতুন বাড়িতে গিয়েই উঠবে।

অতএব বর্তমান জেনারেশনের 'হৃদয় দুয়ারে' আঘাত হানবার সুযোগ পেলেন না হারাধন।

তিনি জনে জনে প্রশ্ন করলেন, তবে তোমরাই বলে দাও, আমি কোথায় যাব? যমের বাড়ির পথ তো জানা নেই, একটা কোথাও তো উঠতে হবে?

ন আর ছোট, শমনবিজয় আর ত্রিদিববিজয়, এঁরা খুব হালকা। এদের এখন লোয়ার সার্কুলার রোডের ভাবী ফ্ল্যাটের জন্য নাম রেজিস্ট্রি করা হয়েছে মাত্র, কারণ 'সবুরে মেওয়া'য় বিশ্বাসী এঁরা।

কাজেই যতদিন না সে মেওয়া ফলে, এঁদের একজন গিয়ে উঠবেন শ্বশুর-বাড়িতে, অপরজন বড়লোক শালীর বাড়িতে। এঁদের এখনো ছেলের বিয়ে হয় নি, সমস্যা কম।

এঁরা এখন অবলীলায় বললেন, আমরা কী বলব, বলুন? আমরাই পরের বাড়িতে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি।

হারাধন যখন দেখলেন কোথাও চেপে ধরবার মতো একটু দুর্বোঘাসও নেই তখন মরীয়া হয়ে যথেচ্ছ গালাগালি দিলেন। বললেন, তোমাদের হচ্ছে ঘর থাকতে বাবুই ভিজে!...সাধ করে 'সাধের কাজল' পরে চোখ জ্বালা

…বাপপিতমোর চিহ্নভরা লক্ষ্মীর ঘটপাতা বাড়িখানাকে মাড়োয়ারির হাতে তুলে দিতে বুকে বাজল না।…ভালো হবে না তোমাদের ভালো হবে না। এই অনাথ অক্ষম বুড়োর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করলে, ভগবান তার বিচার করবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব শেষ সহানুভূতিটুকুও হারিয়ে বিদায় নিলেন হারাধন কে জানে কোন্ পথের উদ্দেশে।

সুশীলাবালার অবস্থা স্বতন্ত্র। সুশীলাবালা 'অনাথ' নয়।

দেশে অনেক নাকি তার জমিজমা জ্ঞাতি-গোত্তর আছে। সুশীলাবালা একদা রান্নাঘরের 'গুছুনি' হয়ে এ-বাড়িতে এসে ঢুকেছিল। যখন দু'খানা বঁটি না পাতলে গেরস্তর কুটনো হয়ে উঠতো না। থাকতে থাকতে বুড়ো হয়ে গেছে। ইদানীং আর মাঝে মধ্যে দু-চার দিনের জন্যে দেশে গিয়ে জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়া করে, বেলটা নারকেলটা, চিঁড়েটা, মুড়ির চালটা নিয়ে নিয়ে এসে জমির স্বত্ব স্বামীত্ব রেখে উঠতে পারত না। এখানের আশ্রয় গেলে, সে খুব খানিক কেঁদে কেটে, ভগবানকে শাপশাপান্ত করে, একদিন বাসন-মাজা মেয়ে সত্তুর ছেলেটাকে কর্ণধার করে দেশে চলে গেল।

এ-বাড়ির পরিত্যক্ত একটা বড় ট্রাঙ্ক ছিল। সুশীলার সারা জীবন সেটাতেই তার জীবন ভরা থাকতো, সেই ট্রাঙ্কটা বাদে আরো গোটাকতক চটের থলি আর ছেঁড়া কাপড়-গামছায় বাঁধা পুঁটুলিতে কী নিয়ে গেল সে, এইটা জানবার জন্যে অনেক কৌতূহলী চোখ উঁকিঝুঁকি মারতে চেষ্টা করলেও, 'সার্চ' করবার প্রশ্নটা ওঠাতে পারল না কেউ।

সেই চিরন্তন সমস্যা।

বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?

সুশীলাবালার মেজাজটি তো ঠিক নামের অনুরূপ নয়? সে এই অপমানের কী শোধ নেবে কে বলতে পারে? কিছু না হোক সারা পাড়ায় চিৎকার করে রটিয়ে বেড়াতে পারে বড়মানুষের গিন্নীদের এই নীচতার কথা। চির-কালের পরিচিত পাড়া।

রটনা হবার ভয়েই তো 'নীচতাকে' নীচের তলায় চেপে লুকিয়ে রাখতে হয়।…সুশীলা অতএব যাবার সময় সবাইকে গড় করে করে, বিদায় নিল।

কিন্তু আশ্চর্য সমাধান হয়ে গেল বিভাবতীর সমস্যার।

বিভার ব্যাপারে সকলের মনেই চলছিল দু' রঙের সুতোর টানাপোড়েন। বিভা সুন্দরী সুহাসিনী, অমিত, কর্মক্ষমতাশালিনী, মধ্যবয়স্কা এবং থান পরা। বিভা যার সংসারে যাবে, সে 'তরে' যাবে। একাই বিভা সংসার মাথায় করে রাখবে। অথচ লোকের কাছে সৌষ্ঠব, এমন একখানা ননদ থাকায়। বলতে গেলে বাড়ির শোভা। আজকালকার দিনে কে থাকে এরকম ? তিনটে মানুষের কাজ পাওয়া যাবে বিভার কাছ থেকে। অথচ মাইনে লাগবে না।

কিন্তু সমস্যা ওই মেয়ে।

বিয়ের যোগ্য একটা মেয়ে, তাও আবার কলেজে পড়ুয়ে। তার দায় নেওয়া তো সোজা নয় ? মেয়েটার যদি এই হরিঘোষের গোয়াল থেকে বিয়ে হয়ে যেত, নির্ঘাৎ বিভাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত।

কিন্তু ওইখানেই সমস্যা। সবাই—লোভে পড়ে মনে মনে ভাবছে, 'আমি বলবার আগেই আর কেউ না বাগিয়ে নেয়।' অথচ আবার নিজে বলতে গিয়ে বলছে না, সাত পা পিছোচ্ছে।

বিভা নিশ্চুপ।

ওর যে বাসা ভাঙছে, এমন ব্যাকুলতার চিহ্নমাত্র নেই বিভার আচরণে। অবশ্য এই রকম আত্মস্থই সে চিরকাল। পাঁচজনের বাড়িতে এর কথা ওর কাছে, আর ওর কথা এর কাছে চুপিচুপি ফাঁস করার যে ধর্ম আশ্রিত-দের মধ্যে অবধারিত থাকে, বিভার মধ্যে তার বালাই মাত্র নেই।

বিভাকে কেউ কোনো ব্যাপারে সাক্ষী মানাতে চাইলে, ও বলে ওঠে আমি বাবা অত লক্ষ্য করি নি। আমি বাপু অত কান করি নি।

তবু বিভার আত্মস্থতা দেখে পাঁচ গিন্নীর মনেই সন্দেহ, তলে তলে কেউ কিভাবে নিজের স্যুটকেসে ভরে ফেলে নি তো ?

এমতাবস্থায় মুশকিল আসান। অদ্ভুত আশ্চর্যপথে।

সময় যখন সংক্ষেপ, হঠাৎ বিভা বলে বসল, তোমাদের তো সকলেরই নানা সমস্যা, আমি বরং আমার দ্যাওরের কাছে চলে যাই।

তোমার দ্যাওর !

আকাশ থেকে পড়া ছাড়া আর কে কী করতে পারে ?

বিভার যে একজন দ্যাওর আছে, একথা কেউ জানতো, কেউ জানতই না। বিভাও তো নিটুট ভাবেই ভুলে বসে থেকেছে। না কোনো যোগা-যোগ, না তার সম্পর্কে কোনো উল্লেখ। লোকমুখে শোনা, লোকটা দারুণ চাকরি করে, দারুণ কোয়ার্টার্সে থাকে, দারুণ সাহেব।

হঠাৎ সেই অজ্ঞাত অপরিচিত সাহেব দ্যাওরের কাছে গিয়ে থাকার প্রস্তাব করে বসলো থানপরা হাত শুধু বিভা ? এ আবার কি রকম লোকহাসানো দুঃসাহস ? তুমি চলে গেলেই সে থাকতে দেবে ? গেটের মধ্যে ঢুকতে দেবে কি বাইরে থেকেই হ্যাট্ হ্যাট্ করবে তার ঠিক কি ?

বিভা সম্পর্কে সকলের কিছুটা শ্রদ্ধা সম্মান এবং মমতাবোধ ছিল। বিভা যে হঠকারিতা করে একটা অপমানের ধাক্কা খাবে, এটা কেউ চায় না। তাই সবাই বিভাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটার অযৌক্তিকতা।...

বিভা হেসে বললো, তাড়িয়ে দিলে তোমরা তো আছোই। তোমরা তো আর তাড়িয়ে দেবে না ?

হারাধন কাকার ঘটনাটা ক'দিন আগে ঘটে গেছে।

একটু থতমত খেলো সবাই। তবু বললো, সে তো নিশ্চয়। আমরা তো ভাবছিলাম, ইয়ে কিন্তু তোর হঠাৎ ওই দ্যাওরের কথা মনে এলো কী করে ? সাতজন্মে তো উদ্দিশও করে না।

বিভা হাসল, মনে থাকলে তো উদ্দিশ করবে ? এতোকাল কেটে গেল। সে কোথায় আর আমি কোথায় ?

খোঁজ করা উচিত ছিল তাঁর। অবস্থা যখন ফিরেছে ভাবা উচিত ছিল, বিধবা বড় ভাজ আছেন আমার।

আমার তো মনে হয় কি ছিল আর কি না ছিল ভুলেই মেরে দিয়েছে। অবস্থা তো তখন ওর আমারই মতো। মা নেই, বাপ নেই, থাকার মধ্যে ছিল দাদাটি। তা সেও তো অকালে কেটে পড়ল। ও বেচারী তখন নেহাতই স্কুলের ছাত্র।...দু'জনেই একসঙ্গে অকূলে ভাসলাম। তা আমায় কুড়িয়ে নিয়ে এলেন ছোড়দাদু। ওকে নিয়ে গেলেন আমার শ্বশুরের এক বড়লোক বাল্যবন্ধু। বিপদের সময় যিনি এসে পড়ে দেখাশোনা করেছিলেন।

তিনিই ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমেরিকায় পাঠিয়ে বিদ্যা-দিগ্গজ করে নিয়ে এসে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন আর নিজের কোম্পানির একজন ডিরেক্টর করে দিয়েছেন।

ওঃ সবটাই অভিসন্ধি-প্রণোদিত।

একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন মেজদা।

অভিসন্ধিহীন মহত্ত্ব জিনিসটা অন্যের পক্ষে একটু গুরুপাক।

বিভা একটু হাসল।

মেজদা বললেন, যাবে তো বলছো, কে তোমায় পৌঁছতে যাবে বাবা বড়-লোকের বাড়িতে। দ্বারোয়ানের গলাধাক্কা খেতে ?

বিভা বললো, রেখে আসতে হলে যাচ্ছে কে ? গাড়ি ফাড়ি তো আছে নিশ্চয়, পাঠিয়ে দিতে লিখছি।

এখন বিভা উঠে গিয়ে ঘর থেকে একখানা চিঠি নিয়ে এলো। মেজদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, দুগ্গা বলে এইটা ছেড়ে দিচ্ছি। দেখি চিনতে পারে কিনা।

দেখে মেজদা ভুরু কোঁচকালেন। ভেবেছিলেন, ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের গাঁথা গেয়ে, আর পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দু'চার পৃষ্ঠার একখানা চিঠি বানিয়ে ফেলেছে বিভা। তা নয় লাইন তিন চারে সারা।

রুদ্ধশ্বাসে লাইন ক'টা পড়ে ফেললেন মেজদা। তারপরই হঠাৎ স্বভাব বহির্ভূত উচ্চরবে হেসে উঠে সবাইকে ডাক দিয়ে উঠলেন, এই শোনো শোনো, দেখো তোমরা শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। এই ঢিলে উনি ঈগল পাখি মারবেন।

উচ্চরবে পড়েই ফেললেন চিঠিটা—

স্নেহের কানু,

মরামানুষকে কথা কয়ে উঠতে দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছ তো ? যাও। কি আর করা। এখন কথাটা শোনো—অনেককাল তো মামার বাড়ির আদর খেলাম বাকি জীবনটা শ্বশুরবাড়ির ভাত খাবার বাসনা। বাসনাটা তোমাকে জানানো ছাড়া উপায় কি ? তাই জানালাম।

পত্রপাঠমাত্র নীচের ঠিকানায় একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা

করবে। আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশল। সকলে আশীর্বাদ নাও। ইতি—

তোমার 'ভুলে মেরে দেওয়া বৌদি' (বিভাবতী দেবী)

ঠিকানা মিঃ কে. এন. রায়।…হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট।

শুনলে ?…'বাকি জীবনটা উনি শ্বশুরবাড়ির ভাত খাবার বায়না…পোষণ করছেন,' এই বার্তা পেয়ে সাহেব ছ্যাওর পত্রপাঠ মাত্র গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবে, এই আশা শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর।…নাঃ বুদ্ধি সুদ্ধি আর হলো না তোর কোনোদিন। তাই বল যে, অনেকদিন দেখি নি, একবার দেখতে ইচ্ছে হয়। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা তা নয়—ওহে বুদ্ধিমতী বিভাবতী আপনার কি ধারণা আপনার ওই কে. এন. রায় মশাই পত্রপাঠ মাত্র গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলবেন আপনাকে —বাকি জীবনটা শ্বশুরবাড়ির ভাত খাওয়াতে ? 'সংসার' জায়গাটি যে 'কী', জানলে না তো কখনো।

বিভা হাসল।

'সংসার' জায়গাটা যে কী সেটা না জানাটা স্বীকার করে নেওয়া নির্মল হাসি। বললো, তুমিও যেমন মেজদা, শূন্যে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলাম। লাগে তাক্ না লাগে তুক।

৭

কিন্তু আশ্চর্য ! দেখা গেল সংসার-অনভিজ্ঞ অবোধ বিভার 'তাক্'টা ভুল হয় নি। ঢিলটা যথাস্থানে গিয়ে লেগেছে। 'ঈগল'লট্‌কে এসে পড়েছে।…

চিঠি পাঠানোর পরের পরদিনই অভিজাত চেহারার একখানা গাড়ি এসে থামলো এই বিদীর্ণ বক্ষ বৃহৎ বাড়িখানার জীর্ণ গেট-এ।…চেনাবার জন্যে ড্রাইভারের হাতে বিভারই চিঠিখানা। তার ওপিঠে লেখা, 'নিজে যেতে পারলাম না, ক্ষমা করে নিয়ে চলে আসবেন। প্রণত কানু (কান্তিকুমার রায়।) অবাঙালী ড্রাইভার সে শুধু জানাল—'সাহাব ভেজ দিয়া।'

এ সংসারের গালে যেন ঠাস করে একটা চড় পড়ল।

এ আশা কেউ করে নি। সকলেই মনে মনে হেসেছে।

এখন হতাশ্বাসের ক্রুদ্ধ যন্ত্রণা।···যেন নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রে বিভা তাঁদের দারুণ ঠকালো। না কারুর সঙ্গে পরামর্শ, না কারুর মত নেওয়া, একেবারে বড় গাছে গিয়ে নৌকো বাঁধা হলো।

মেজদার মতো অতটা না হলেও, সকলেই যেন অপমানাহত।

আবার মনে মনে হিসেব কষছেন, বিভাকে হারিয়ে কী পরিমাণ লোকসান ঘটলো তাঁদের।

যে মোটা লাভটা হতে পারতো, সে ঘরে শূন্যি পড়লে লোকসান ছাড়া কী ?

রাগের পর অনুতাপও। 'আমি তোকে নেব' আগে থেকে এ আশ্বাস দিয়ে রাখলে, ও অমন অসমসাহসিক কাজটা করে বসতে পারতো না। মেয়েটার তো শীগগির বিয়েই হয়ে যেত। তারপর নিরঙ্কুশ একটা কর্মযন্ত্র লাভ।

বিশ্রী রকমের ভুল হয়ে গেছে।

কিন্তু এখন আর সে ভুলের সংশোধন নেই। পাখি হাতছাড়া হয়ে ডানলো-পিলোর গদি মোড়া গাড়িতে গিয়ে উঠে বসেছে। তবে জনে জনে প্রণাম নমস্কার করে গেছে বৈকি।···মৃত গুরুজনদের ছবি টাঙানো দেয়ালে মাথাও ঠুকেছে। ছোটদের কাছে এসে চোখের জলও ফেলেছে বিস্তর, তবু চলে গেল যেন টুক করে। যেন আলগা শিকড়ের ঘাসের চাপড়াটা কারো মুঠোর টানে মাটি থেকে উঠে গেল।

অতএব পিছনে সমালোচনার ঝড় বইবে বৈকি! কে না বলবে একেই বলে 'পর'। পর কখনো আপন হয় না! এতোদিন এখানে আশ্রয় পেলি, আর যেই না দিন পেলি অমনি অক্লেশে পেছন ফিরলি ?···একেই বলে, 'ড্যাঙায় উঠলেই নৌকোয় লাথি।'

তবে হ্যাঁ শেষ ভরসা এই—

সাহেব ছাওরের ঘরে ক'দিন টিঁকতে পারবেন বিভাবতী দেবী ?

বড়লোকরা তো আবার মোদো মাতালও হয়। নেহাত বুড়োও তো হও নি তুমি।···আর তাও যদি না হয়, ছাওর না হয় উত্তম চরিত্র। মানুষ্যত্ব দেখাতে এক কথায় নিয়ে গেল। কিন্তু ঘরে বৌ নেই তার ? বড়লোকের মেয়ে। সে হঠাৎ সংসারে এই উড়ো আপদের আবির্ভাব সহ্য করবে ?

থানপরা বিধবা, পুজো-আচ্চা গোবর-গঙ্গাজল নিয়ে কারবার। তাকে সয়ে নেবেন সেই মেমসাহেব?

নাকে খৎ দিতে দিতে চলে আসতে হবে বাবা, এই বলে রাখলাম।

অবশ্য এসব হচ্ছে অনুক্ত ভাষণ।

যা উক্ত, তা হচ্ছে, যাঁরা শ্বশুরবাড়ি শালীর বাড়ি থাকতে যাচ্ছেন, তাঁরা বাদে বাকি তিনজনই নিজ নিজ ভাবী ঠিকানাটা লাট্টুর হাতে গছিয়ে দিয়ে উদার অনুজ্ঞা দিলেন, একটু অসুবিধে বোধ হলেই চলে আসবি মাকে নিয়ে। বুঝলি তো? আমরা তো রইলাম। মরি নি তো।

কিন্তু টের পাওয়া যাচ্ছে না, সেই 'একটু অসুবিধেটা' ঘটছে কিনা। দিন তো কেটে গেল অনেকগুলো। যে যার নিজ নিজ অভীপ্সিত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যাঁরা শালী শ্বশুরের হেফাজতে ছিলেন, তাঁদেরও দুঃখের রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। নবনির্মিত ফ্ল্যাটে—অ্যালটমেণ্ট চলছে।

ভবানীপুরের সেই দেড়শো বছরের ইটের খাঁচার পাঁজরে পাঁজরে ঘা পড়ছে শাবল কোদাল গাঁইতির। স্তূপাকার হয়ে পড়ছে ইট রাবিশ কড়ি বরগা, বৃহৎ বৃহৎ জানলা দরজা শার্সিখড়খড়ি, বারান্দার রেলিং।···চলে ও যাচ্ছে লরী লরী!···এসব জিনিস আধুনিক বাড়িতে অচল। যারা কিনেছে, তারা সবটা ভূমিসাৎ করে ফেলে দশতলা ম্যানসন বানাবে।

৮

এই রণুদা, ডালমুটের ঠোঙাটা কী করলে?

ফেলে দিয়েছি। যা এস্তার চালাচ্ছিলি। ডাক্তার ডাকতে হতো।

বাজে কথা রাখো। ভারী গার্জেন এলেন। ফেলে দিয়েছি। আহ্লাদ, দেখি তো—

লাট্টু রণুর প্যাণ্টের পকেট হাতড়ে বার করে ফেলল লুকনো মাল।

ইস ঠোঙাটা ছিঁড়ে গেল। বেশ হয়েছে পকেটে তেল মশলা লাগুক।··· আরে এটা কি?

ঠোঙার সঙ্গে একটা স্লিপ উঠে এসেছে।

কী গো এটা রণুদা? প্রতীক্ষা বৌদির হাতের লেখা না?…গোলাপের চারা ২…চন্দ্রমল্লিকা ১ ডালিয়া ৪…লতানে জুঁইয়ের চারা ?…বেল মল্লিকা রজনীগন্ধা ২ তিনটে করে। উপযুক্ত সার। (কোন্ ধরনের মাটি দরকার জেনে আসা)…বাগান করবে বুঝি বৌদি?

রণু বললো, সেরেছে। একদম ভুলে গেছি, আজ বৌদি খুব আশা করবে। তারপর হেসে উঠে বললো, মূঢ় বালিকার এই রকমই একটা বাসনা। নীহারকণা দেবীর ভূমিতে তিনি গোলাপ ফোটাবেন।

আহা তাতে কী? বৌদিটা তো বরাবরই একটু ভাবুক ভাবুক।…এই খোলামেলায় এসে বোধহয় খুব খুশী?

নীহারকণা দেবীর সংসারে 'খুব খুশী' থাকাটা 'খুব' ক্ষমতা সাপেক্ষ।

আচ্ছা! তোমার কেবল মাতৃনিন্দে। কেন বাপু সেজমামী তো বড়মামীর মতো প্রচণ্ড শাশুড়ী নয়।

প্রচণ্ডের পরিমাপ সহনশীলতার ওপর। লোহার কড়াই সারাদিন জ্বলন্ত আগুনে বসে থাকতে পারে। কাঁচের গ্লাসে ফুটন্ত জল ঢাললেই ফাটে।

থামো! কেবল কথার কায়দা। নাও ধরো।

ডালমুট দিলো একমুঠো।

এখন বিকেল আসন্ন।

হাওয়া বইছে জোরে। মাঠের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি আসছে ওরা। লাট্টুর চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে, সামলাতে সামলাতে অস্থির। পিছিয়ে পড়ছে।

কাছাকাছি হতে বলে উঠল, খুব তো বলা হলো তখন, ফেরার সময় রেলগাড়ি চড়াবে! কই? আবার সেই বাস।

রণু বললো, ক্যালকুলেশন করে দেখলাম, ট্রেনে অনেক বেশী সময় লাগবে। আজ সেটায় সুবিধে হবে না।

তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে লাট্টুর কপালের উড়ন্ত চুলগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বললো, ওইটুকু রেলগাড়ি চড়ে কী হবে? তোতে আমাতে তো ফার্স্ট চান্সেই ভারতভ্রমণ করবো।

আবার ওই সব কথা ?

লাট্টু একটু চেয়ে দেখে বললো, যা হবার নয়, তা নিয়ে কল্পনা করে লাভ কী বলো তো ?

রণু রেগে উঠে বলে, তোরও সেই এক কথা ? যা হবার নয় ! বিবো পিসি আমার নিজের পিসি ?

হিসেব মতো হয়তো নয়। তবু ওতেও বোধহয় বাধা থাকতে পারে।

'বোধহয়'টা একটা যুক্তি নয়।

রণুর গলার স্বর এখনো রাগী।

লাট্টু অসহায়ভাবে বলে, চিরদিন আমরা একসঙ্গে ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছি—

'হয়েছি' বলেই ভিতটা মজবুত।

বাঃ ! কী যে বল। লোকে কি বলবে ভাবো ?

চুলোয় যাক 'লোক' আর তাদের বলা। এখন তোর সেই বিরাট 'লোক-সমাজ' তো পেঁজা তুলোর মতো হাওয়ায় ভেসে ছড়িয়ে পড়ল।···আপা-ততঃ লোক বলতে তোর সাহেব কাকা আর মেম কাকীমা।···তাঁরা ওই 'মতন'টা নিয়ে মাথা ঘামাবেন বলে মনে হয় না।

লাট্টু হেসে ফেলে বলে, তা ঘামাবেন না সত্যি।

তবে আবার কি ? আমি আজই বিবো পিসিকে বলছি গিয়ে।···

এই রণুদা। দোহাই তোমার। আজ কিছু করতে যেও না। পরিস্থিতি দেখছ তো ? লীলাধামে আসবো বলে কখন বেরিয়েছি, সেখানে না গিয়ে নিজেই নানা লীলা করে এতো বেলায় ফিরে হঠাৎ—

এতো বেলায় ফিরে কে বললো ? এখন তো ফিরছি না।

লাট্টু ভয়ের গলায় বলে, তবে ? আবার কী মতলব তোমার ?

ভয়াবহ কিছু নয়।···এখন সেই 'লীলাধামেই' যাওয়া হচ্ছে।

সর্বনাশ ! কখন বাড়ি ফিরব তবে ?

রাত্তির আটটা নটা সাড়ে নটা। রাস্তাটা তো দেদার।

রণুদা পাগলামি করবে না। আমায় ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই।

তোমায় ছেড়ে দেব ? ও আশা ছাড়ো। জীবনেও ছাড়ছি না।

হাঁটতে হাঁটতেই বা বলতে গেলে ছুটতে ছুটতেই কথা বলছিল ওরা, এখন দাঁড়িয়ে থাকা বাসে উঠে এসে গুছিয়ে বসল। আর তারপর রণু কথা শেষ করল, যা করবো, ঠিকই করবো। গরুর মতো ড্যাবডেবে চোখ মেলে শুধু দেখে যা।

গরুর মতন? ওঃ—আচ্ছা ঠিক আছে।

লাট্টু জানলার বাইরে মুখ রেখে বসল।

রণু একটুক্ষণ চুপ করে বসে আবার ওর মসৃণ ঘাড়ের আশ্চর্য সৌন্দর্যটা উপলব্ধি করতে থাকে। একেই কি কবিরা মরাল গ্রীবা বলে?...

আজ লাট্টু খোঁপা বেঁধেছে বলেই ঘাড়টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সেটা জানে না রণু।

আবার লোকজন ওঠে।

বাস ছাড়ে।

রণু আস্তে বলে, এই শোন। কিছু অনৃতভাষণ না চালালে ঠিক ম্যানেজ করা যাবে না। তুই যেন হঠাৎ বেফাঁস কিছু বলে বসিস নি।

আমার এসব মিথ্যে কথা-টথা আসে না।

আসাতে হবে বাবা। মনে করতে হবে, 'এ জগৎ মিথ্যা দিয়ে গড়া। সবই মিথ্যা এ ভব সংসারে।'

লাট্টু হেসে ফেলল।

রণু বললো, তোর প্রতীক্ষা বৌদিটির মতো আগ্‌মার্কা হলে, এ পৃথিবীতে চরে খাওয়া কঠিন।

বাস চলে আসছে আবার সেই পূর্ব পথে।

একসময় রণু বলে উঠল, সাহেব কাকার বাড়িতে খুব খারাপ আছিস বলে মনে হচ্ছে না। আগের থেকে আরো ফর্সা হয়ে গেছিস।

কী কথা রে! ফর্সার সঙ্গে ভালো থাকার কী?

পুরোপুরিই। আরামে আহ্লাদে থাকলেই লোকে ফর্সা হয়।

এসব মেয়েলি কথা কে শেখাচ্ছে তোমায়?

নীহারকণা দেবীর ছেলের কথা শেখার অভাব? তা যাক গে বড়লোকের বাড়িতে আরাম আয়েসটা এমন কিছু বাড়তি পাওনা নয়। আপসেই মেলে।

কাকা লোক কেমন ?

তোমরা যতটা নাক উঁচু ভাবো ততটা নয়। আমাদের কাছে তো নয়ই। কাউকে না দেখে রিমার্ক করতে নেই।

আমরা তো সর্বদাই জীবনে একবারো না দেখেই, রিমার্ক করে থাকি। ওটা কিছু নয়। তা হলে লোক ভালোই ?

আমার তো ভালোই লাগে।

আর মেমসাহেব ?

লাট্টু হেসে ফেলে বলে, তাঁর সম্পর্কে এককথায় কিছু বলা শক্ত। এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ। অন্যের সঙ্গে ব্যবহার খারাপ নয়। আমার প্রতি তো বেশ একটু স্নেহ স্নেহ ভাবই আছে, যদিও সেটা প্রকাশ করতে নারাজ। কিন্তু কাকার সঙ্গে? উঃ! সেই যে বড়মামী বলে 'আদায় কাঁচকলায়', ঠিক তাই। যতটুকু বাড়িতে থাকে, শুধু ঝগড়া চালিয়ে যায়। একতরফাই অবশ্য।...

'যতটুকু বাড়ি থাকে?' চাকরি টাকরি করে বুঝি?

মস্ত চাকরি খুঁটির জোরের ব্যাপার আর কি। বাপের বন্ধুর অফিসে। তা ছাড়া তাসখেলার দারুণ নেশা। অফিস থেকেই চলে যায় ক্লাবে। বাড়ি ফেরে অনেক রাত্তিরে। ড্রিঙ্ক ফ্রিঙ্ক করে বোধহয়। আসে তো টলতে টলতে। তবে যেদিন জুয়ায় জিতে আসে—

জুয়া।

জুয়া না তো আবার কী? তাস নিয়ে কি 'গোলাম চোর' খেলে? তা যেদিন জিতে আসে, সেদিন টলে কম, আমাদের সঙ্গে সৌজন্য করে কথা বলে, হয়তো ঘুমন্ত ছেলেটাকে টেনে তুলে আদর করতে বসে।...

ছেলে আছে বুঝি ?

আছে না? রহস্য তো সেইখানেই। আমরা এখানে আসার আগে ছেলেটার দুর্গতির একশেষ ছিল, আমাদের থাকায় সে অবস্থা গেছে। ছেলেটা বেঁচেছে, ছেলের মাও বেঁচে গেছে। তাই হঠাৎ ঘাড়ে এসে পড়া আত্মীয়র প্রতি বিরূপ নয়। বরং বেশ সন্তুষ্ট। মাঝে মাঝে যেন কৃতজ্ঞও।

রণু বললো, তুই কিন্তু আমায় গোলমালে ফেললি লাট্টু। হাঙ্গারফোর্ড

স্ট্রীটের সাহেবের একমাত্র পুত্রের 'ছুর্গতি' মানে ? দশদিকে দশটা আয়া নেই ?

লাট্টু হেসে ফেলে বললো, আমরা তো এসে দেখলাম একদিকে একটাও নেই। কাকী অফিস যাবার কালে ছেলেকে বাপের বাড়ি রেখে যায়, আর কাকা ফেরবার পথে নিয়ে আসে। কাকীর তো ফেরার সময়ের স্থিরতা নেই।

খুব কৃপণ বুঝি ?

আরে দূর।···'ডেলি' চল্লিশ টাকা দিয়ে নার্স না আয়া রেখে রেখেও টেঁকাতে পারে না। অত মেজাজী মেমসাহেবও নাকি তাঁদের 'বস'-এর মতো তোয়াজ করেন। তবু সন্তুষ্ট রাখতে পারেন না। কাকীর ভাষায়— যিনি আসেন তিনিই যেন এক একখানি নূরজাহান, ক্লিওপেট্রা···মহিলার ছুঃখের কাহিনী শুনলে তুমি হেসেই অস্থির হয়ে যাবে রণুদা।

ছুঃখের কাহিনী শুনে হেসে অস্থির হবো। আমায় তুই এমনই হৃদয়হীন ভাবিস ?

আহা ছুঃখটা কি শোনো।···ওই মহা মূল্যবান মহিয়সীদের জ্বালায় জ্বলে, উনি 'দেশী আয়া' রাখতে চেষ্টা করলেন। কমবয়সী, ভদ্র চেহারা, অথচ মাত্র মাসে ছুশো টাকা মাইনে—

মাত্র ছুশো !

তা আগের তুলনায় ভাবো। তা তারা না ? হি হি হি···

এই আস্তে হাস। লোকে তাকাচ্ছে—

লোককে তো তুমি কেয়ার কর না।

আহা সব ক্ষেত্রে কি আর ?

তারা না খিঃ খিঃ···মেমসাহেবের আড়ালে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে তাঁর যতো সব দামী-দামী সাজবার জিনিসগুলো মানে স্নো পাউডার ক্রীম-ট্রীম নেল্ পালিশ লিপস্টিক ইত্যাদি সব নিয়ে যত ইচ্ছে সাবাড় করে রাখে। হি হি ব্যাভার জানে না তো ? শিশি কৌটোর মধ্যে খাবোল মেরে···হি হি সেজে, হি হি আবার ফ্রীজ খুলে খুলে যা পায় খেয়ে নেয়। রান্নার লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। 'বাদশা'কে দেখেও না। একদিন নাকি সিঁড়ি

থেকে পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি। রান্নার লোকটা বলে দেওয়ায় তার সঙ্গে নাকি হি হি মারামারি।

মার্ভেলাস।

আর একজনের নাকি আবার হি হি···লাট্টু গলার স্বর নামায়, রান্নার লোকটার সঙ্গে দারুণ প্রেন। হি হি···দুপুরে ঘুমন্ত বাদশাকে একা রেখে হি হি গিয়েছিলেন সিনেমা দেখতে। নাকি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে গিয়েছিল। রাত অবধি ছেলের ঘুমই ভাঙে না। আর একটা নেহাত বাসনমাজা ক্লাশের লোক রাখা হলো। স্নো পাউডার সিনেমা এসবের ধারে কাছে যাবার মতো নয়, ফ্রক খুলতে জানে না। শুধু ছেলে দেখবে। তিনি নিঃশব্দে কাকার ভালো ভালো সব অনেক শাড়ি হাতিয়ে চলেন। একদিন হাতে হাতে ধরা পড়ে দেখা গেল শুধু শাড়িই নয় বাসনপত্রও। রান্নার লোকও তো রোজই নতুন নতুন। কে কাকে পাহারা দেয়? প্রথম প্রথম নেশার ঝোঁকে বলে ফেলেছিল এসব। এখন আর আয়া-টায়া নেই। শান্তি।

সে-কাজটা তুই-ই চালাচ্ছিস বোধহয়?

রণু ব্যঙ্গ হাসি হাসল।

লাট্টু বললো, খারাপ করে বলছ কেন রণুদা? চিরকালই তো বাচ্চাগুলোকে চরিয়ে আসছি। ভবানীপুরের বাড়িতে ও জিনিসটার তো আর সাপ্লাইয়ে ছেদ পড়ত না? পরীক্ষার পড়া পড়ছি, কাছে একটা বাচ্চা নেই। এতো মনেও পড়ে না বাবা? বুলাদির ছেলেটা? কী শয়তান ছিল মনে আছে? ঠিক আমার থার্ডইয়ারের পরীক্ষার সময় বুলাদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এলো শরীর সারতে। উঃ! কী হম্বিতম্বি। কেবলই বাবুয়ার কান্না শুনতে পাচ্ছি কেন লাট্টু? পরীক্ষার পড়া তো বাবা রাত জেগেই করতে হয় জানি। তখন তো আর বাবুয়া তোমার কাছে যাবে না।···আমার পরীক্ষার পড়া, একথা মুখেই আনি নি বাবা কখনো। তাও বলেছেন। এ ছেলেটা দারুণ ভদ্র। মানে আয়া-টায়ার কাছে মানুষ হয়েছে তো? 'দিদি' পেয়ে বিগলিত। তাছাড়া আমার মার তো এখন কাজ নেই বেশী। মাও দেখে সর্বদা।

এই, এসব কথা যেন লীলাধামে গল্প করিস না। নীহারকণার অসীম ক্ষমতায় এক একটি ওয়ার্ড একশততে পরিণত হয় জানিস তো?

আচ্ছা তোমায় আর শেখাতে হবে না। কোথায় কি বলতে হয়, আর হয় না, এই শিখতে শিখতেই তো বুড়ো হলাম।

বুড়ো হলি ?

না তো কী ? বড় মামী বলতো শোনো নি, মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই বুড়ী।

তুই কুড়ি পেরিয়েছিস ?

ঢং কোরো না। সে তো কবে। স্কুলে ভর্তি হয়েছি কত বেশী বয়েসে ভাবো ? ঠিক বয়েসে পড়তে পেলে এতোদিনে তো এম. এ. পাস করে বেরিয়ে পড়ে চাকরি করতে পারতাম।

চাকরি ! কোন্ পাড়ায় গাছটা আছে রে ? ঠিকানা দে না একটা পেড়ে নিইগে।

আহা ! তুমি বুঝি এক্ষুনি চাকরিতে ঢুকবে ? রিসার্চ শেষ না করেই ?

রিসার্চ ? ওটা তো লোকের কাছে মান রক্ষার একটা কলকাঠি রে। নিজের কাছেও। বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভাবতে দুঃখ লাগবে তো ? তাই—

এই রণুদা, তুমি না বলেছিলে তোমার দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগে। ওই এক্স-পেরিমেন্টটা।

বলেছিলাম। এখন আর বলছি না। এখন তাড়াতাড়ি পায়ের তলার মাটি খুঁজছি।

এতো তাড়াটা কিসের ?

রাগাস নি লাট্টু, ভালো হবে না।

হৈ-চৈ করতে করতে 'লীলাধামে' ঢুকে পড়ল রণু। এই ছ্যাখো কাকে নিয়ে এলাম। পথ খুঁজে না পেয়ে রাস্তায় ঘুরে মরছিল !

এই রণুদা ভালো হবে না বলছি।

এই চুপ ! কী বলেছিলাম ?

নীহারকণা ছুটে বকতে আসছিলেন। কোন্ সকালে বেরিয়েছিস, এখন ফিরলি ! দুপুরবেলা ভাত খেতে পর্যন্ত এলি না—

বলতে গিয়ে লাট্টুকে দেখে থমকালেন।

সকালে বেরিয়ে দুপুরে ভাত খেতে পর্যন্ত না আসা রণুর নতুন নয়। ভবানী-

পুরের সেই নিয়মের বাড়িতে রণবিজয় একটি মূর্তিমান অনিয়ম। তবে শহর থেকে দূরে এসে পড়ে নাওয়া-খাওয়ার অনিয়মটা আরো বেড়েছে। বকলে বলে, দুটি ভাত খাবার জন্যে দশ মাইল পথ পাড়ি দেব মা, এমনই অভাগা তোমার ছেলে ? কোথাও দুটি ভাত জুটবে না ?

তা জুটবে না কেন ? নীহারকণা বলেন, দেশজুড়ে তোমার কত মাসী। স্নেহের অবতার সব।

তারা তো তোমারই বোন মা। তাই এতো স্নেহশীলা।

আমার বোন মানে ?

বাঃ মাসী আবার কার বোন হয় ?

শুনতে পেলে ভুবনবিজয় হেসে উঠে বলেন, হলো তো ? জব্দ হলে তো ছেলের কাছে ?

জব্দ তো আজন্মই হয়ে আছি। শুধু ছেলে কেন, ছেলের গুষ্ঠীবর্গের কাছে। বলে নীহারকণা হয়তো জব্দের নমুনাগুলো ব্যাখ্যা করতে বসেন।

আজ আর কথা সে পথে প্রবাহিত হলো না।

আজ সঙ্গে লাট্টু।

যার সম্পর্কে এখন অসীম কৌতূহল। তদবোধিতো আর দেখা হয় নি। কে যাচ্ছে ওর সাহেব-কাকার বাড়ি ?

লাট্টুই এখন মাঝে মাঝে অভিযানে বেরোচ্ছে 'অকৃতজ্ঞ' নাম ঘোচাতে। মা বলেছে, তুই তো আর আমার মতো নয় বাবা, যে কেউ নিয়ে না গেলে এক-পা যেতে পারব না। ছুটি-ছাটার দিন যাস এক-একবার সব বাড়িতে। না গেলে বলবে, এতোদিন মানুষ হলো আমাদের কাছে একটু কৃতজ্ঞতা নেই।

লাট্টু মার কাছ থেকে ঠিকানাগুলো নিয়ে হেসে বলেছিল, আর যদি দেখেই ভেবে বসেন, বোধহয় 'অসুবিধেয়' পড়ে কেঁদে পড়তে এসেছে।

থাম তো। ভেবে বসলেই হলো।

এমনিতে লাট্টু ইচ্ছে করেই কোথাও কোথাও গিয়েছে, চিরকালের জানা ঠিকানায়। দীপুদির শ্বশুরবাড়ি, রুমার মামার বাড়ি। ভারী ভালবাসে ওরা লাট্টুকে। তবে অসুবিধে এই ওর কাকার বাড়ি সম্পর্কে সকলেরই

কৌতূহল বড় বেশী।

অনেকক্ষণ পরে নীহারকণাকে তো বলেই বসল লাট্টু, কাকার বাড়ির গল্প আর কত শুনবেন সেজ মামী ? আপনাদের কথা-টথা শুনি। মা তো হাঁ করে বসে আছে শোনার জন্যে।

তোর মার এখনো আমাদের কথা মনে আছে ?

কী যে বলেন ? মায়ের মুখে সব সময় তো আপনাদের সকলেরই কথা।

বললো, আপনি কিন্তু আগের থেকে অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন সেজমামা।

সেজমামা বললেন, রিটায়ার করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

বললো, দেখো সমরদা, তোমরা ছেলেরা পেরে উঠলে না, আমি মেয়ে হয়ে বাড়ি খুঁজে খুজে—

নিজেকে মেয়ে বলে স্বীকার করছিস তাহলে ? সমর হাসল, ছেলেবেলায় কী চটেই যেতিস 'মেয়ে' বললে। তা রণু তোকে কোথায় পেল ?

রণু তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করল, আর বোলো না, আড্ডা-ফাড্ডা মেরে ফিরে বাস থেকে নেমে দেখি মহিলা রাস্তা হারিয়ে দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছেন।

আঃ রণুদা ভালো হবে না বলছি। রাস্তা হারিয়ে ?

তা ঠিকানার কাগজ হাতে করে রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে বেড়ানোকে আর কী বলে ?

রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছিলাম আমি ?

আরে বাবা, করিস নি। করতে যাচ্ছিলি তো ? ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা। উপকারীকে অস্বীকার করাই মানুষের ধর্ম। এ তো জানাই কথা।

প্রতীক্ষার সঙ্গে বড় ভাব ছিল লাট্টুর।

প্রথম দিনই নতুন বৌকে বলেছিল, তোমায় আমার এতো ভালো লাগছে কেন জানো ? নামটার জন্যে। এতো সুন্দর নাম আমি কারো দেখি নি।

প্রতীক্ষা হেসেছিল, আমি না, আমার মায়ের অনেক বড় বয়েসে জন্মে-ছিলাম। প্রায় আশা ছাড়া অবস্থায়। তাই এই নাম।

নীহারকণা আর ভুবনবিজয়ের কবল থেকে উদ্ধার হয়ে প্রতীক্ষার সঙ্গে কথা বলার সময় পেল লাট্টু, একেবারে খেতে বসে।

হ্যাঁ অনেক গল্প হলো, বসা হলো, বাড়ি দেখা হলো, খেতেও হলো। না খাইয়ে

কেউ ছাড়ে 'ঘরের মেয়েকে ?'

লাট্টু বললো, এক্ষুনির মধ্যে এতো সব রান্না করে ফেলেছ বৌদি ? ভীষণ কাজের হয়ে গেছ দেখছি।

প্রতীক্ষা বললো, এখন দেখো রান্নাটা খাদ্যযোগ্য না অখাদ্য।

রণু বললো, তোমার কি বিশ্বাস বৌদি, ও সত্যি কথা বলবে ?

প্রতীক্ষা ওদের দু'জনের উদ্ভাসিত মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখল। তখন থেকেই দেখছে। হয়তো প্রতীক্ষা বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্তই দেখছে। হয়তো বা আরো কেউ দেখেও। দেখে উটপাখির বুদ্ধি গ্রহণ করে।

প্রতীক্ষা এখন আবার দেখল।

প্রতীক্ষার একটা নিশ্বাস পড়ল।

লাট্টু বললো, কোনখানে বৌদির বাগান হবে গো রণুদা ?

এই মা, একথা আবার তোকে কে বলতে গেল লাট্টু।

প্রতীক্ষা অস্বস্তি পেল।

লাট্টু বললো, বলে নি কেউ আমি আবিষ্কার করলাম।

রণু বললো,আর বোলো নি বৌদি। সারাদিন আড্ডা দিয়ে, যেখানে সেখানে খেয়ে দেরি হয়ে গেল। তোমার লিস্টটা পকেটেই রয়ে গেল। সরি।

আরে বাবা থামো। এমন কিছু ব্যাপার নয়। আমার ছেলেমানুষী। ভাবছিলাম, যদি না আনো তো বারণই করে দেব।

রণু একটু তাকিয়ে বললো, কেন ? চারা না পুঁততেই গোলাপ গাছের গোড়ায় কোপ পড়েছে ?

৯

রণুর মধ্যে সেন্টিমেন্টের বালাই আছে বলে মনে হয় না। তবু রণু এ-যাবত ভবানীপুরের ওই পাড়াটায় যায় নি। অথচ ওখানে চিরকালের বন্ধু-টন্ধুরা রয়েছে। আজন্মের খেলার সাথী। এসব হলো ঘরোয়া পাড়া, বাড়িতে বাড়িতে যখন রাস্তার ধারে রোয়াকের চলন ছিল, তখনকার আমলের সব বাড়ি। এ পাড়ার ছেলেদের শৈশব বাল্য যৌবনের সর্ববিধ ভাবপ্রবাহের সাক্ষী

ওই রোয়াকগুলো। আবার বিশেষ কয়েকটি বাড়ির রোয়াক আছে পাড়ার বার্ধক্যের বারাণসী। যত অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় বৃদ্ধদের বৈঠকখানা যেগুলো। তবে বর্তমানে অনেক বাড়ির মালিকই ওই অর্থহীন অপচয়কে আর প্রশয় দিতে রাজী হচ্ছেন না, তাঁরা ওই একফালি দেড়ফালি জমিকেই রীতিমত কাজে লাগিয়ে ফেলছেন। রোয়াকটা ঘিরে নিয়ে দোকানঘর বানিয়ে ভাড়া দেওয়ার নমুনা দ্রুত বাড়ছে।

হলেও—আছেও বৈকি কিছু।

এবং পাড়ার 'মুখোজ্জ্বল' কিছু নিয়মিত সদস্যও আছে এই রোয়াক ক্লাবের।

দৈবক্রমেই আজ রণুকে এ পাড়ায় এসে পড়তে হয়েছে। এসেছিল গত-কাল রাত্রে। যখন এসেছিল তখন কারো সঙ্গে দেখা হবার কথা নয় রাত প্রায় গভীর।

লাটুকে তার কাকার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, তাদের নতুন পাড়ার সেই 'লীলা-ধামে' ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় বলে।

রণু বলেই এসেছিল মাকে, পুরনো পাড়ার কারো বাড়িতে থেকে যাবে। চেনা আর 'বিশেষ চেনা', আত্মীয় আর আত্মীয়-তুল্যের সংখ্যা এখানে এখনো অনেক। রাতটা সুবিমলদার বাড়িতে কাটিয়ে সকালে ফিরে যাচ্ছিল চুপিচুপিই। শাবল হাতুড়ির ঘা খাওয়া সেই বাড়িখানার দিকে না তাকিয়ে তপেনদের রোয়াকের প্রাতঃক্লাব থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এসে পাকড়াও করে ফেলল বিকাশ।

বিকাশের বাজার চলতি নাম 'বিস্কুট'। আর সেটাই সমধিক চালু।

ওকে দেখে হৈ-হৈ করে উঠল 'ক্লাব সদস্যরা'।

এই ছেলেদের প্রায়শই রাত্রে একটা ঘরে অনেকের সঙ্গে শুতে হয়। ঘুম ভাঙলে পড়ে পড়ে গড়াবার উপযুক্ত জায়গা থাকে না। তাই বাসি চোখে-মুখেই এখানে এসে জোটে। জায়গা দখল করে বসে পড়ে। রণুকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বিস্কুট বলে উঠল, কী বাব্‌বা, তুমি যে মাইরী একেবারে আকাশের চাঁদু হয়ে গেলে মানিক। একদিনের জন্যে এলে না। এসো বসে পড়ো। জগুর দোকানে কেটলী চেপেছে দেখে এসেছি নামলেই পাঠিয়ে দেবে।

রণু তাড়াতাড়ি বললো, এই আজ থাক রে। আর একদিন আসবো। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। যাই এখন।

তপন খালি গায়ে একটা পায়জামা পরেই এসে বসেছে। পায়জামার পায়ের আগাটা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। তপনের হাতে একখানা তালপাতার পাখা, তার বাঁট দিয়ে মুখ খিঁচিয়ে পিঠটা চুলকে চলেছিল একমনে। সেইভাবেই খিঁচিয়ে বলে উঠল, খুব হয়েছে। আমাদের কাছে আর রোয়াব দেখাতে আসিস নি রণু।

চুপচাপ বসে থাক, চা এলে খেয়ে তবে যাবি।

লেবু বললো, পাড়া ছেড়ে চলে গেলি, না যেন বিলেত অ্যামেরিকা চলে গেলি। এসে আবার ডাঁট দেখাতে বসছিস ! তুই বিনে আড্ডা তো উঠে যাবারই যোগাড়।

বিস্কুট বলে উঠল, অ্যাই লেবু, একজনকে তোয়াজ করার তালে অন্যদের ইনসাল্ট করার কোনো রাইট নেই তোর। কেন, রণা কি কানু ? তাই মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে বসেছে বলে বেন্দাবন শূন্য ? যাঃ। ওর যদি এতো কাজ থাকে তো যেতে দে।

এরা প্রায় সকলেই ভালো ভালো স্টুডেন্ট ছিল, এখনই বেকার। তবু এরা এই ভাষায় রসালাপ করতে সুখ পায়। এ যেন নিরুপায়তার আক্রোশের একটা বিকৃতি।

অগত্যাই রোয়াকে ফুঁ দিয়ে বসে পড়তে হলো রণুকে। লাট্টুর বড়লোক কাকার বাড়ি আসছে বলে সব থেকে ভালো শার্ট-প্যান্টটা পরে নিয়েছিল হেসে হেসে। প্রতীক্ষাকে ডেকে ডেকে বলেছিল, কী রকম দেখাচ্ছে বৌদি ? দ্বারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দেবার মতো ? না কি কুকুর লেলিয়ে দেবার মতো ?

প্রতীক্ষা হেসে বলেছিল, ঠিক উল্টো। বিয়ের বয়েসের কোনো মেয়ে থাকলে জামাই করে নেবার মতো।

রণু লাট্টুর দিকে একটা কটাক্ষপাত করে বলেছিল, কিরে ? খুঁজলে-টুজলে একটা বিয়ের বয়েসের মেয়ে পাওয়া যাবে তোর কাকার বাড়ি ?

লাট্টু অবলীলায় উত্তর দিয়েছিল, থাকলেও, কুকুর লেলিয়ে দেবে। যা অভদ্র

তুমি।

যা বাব্বা, অভদ্রটা হলাম কিসে ?

সব কিছুতেই। বলছি কাকা ও নয়। তবুও—

প্রতীক্ষা আবার ওদের দু'জনের আলোজ্জ্বলা মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস চেপে বললো, সত্যি রণু! তোমাদের এ একটা ভুল ধারণা। কাকা বেশ ভালো লোক। লাট্টুকে খুব ভালোই বাসেন। বিবো পিসিকেও—

লাট্টুর কেস আলাদা।

বলে বেরিয়ে পড়েছিল রণু।

সেই প্যান্ট পরে ধুলোয় বসতে হলো।

এখন ওটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করাটা হাস্যকর।

তুই যে এ-রকম করবি, আমরা ভাবতেই পারি নি— বললো বন্ধুরা ধিক্কারের গলায়। বাড়িতে পাঁচবরে চা খেয়ে এসেও তোর জগুর দোকানের চা না হলে দিনটা মরুভূমি মরুভূমি লাগতো, মনে পড়ে ?

রণু একটু অপ্রতিভ গলায় বললো, আসলে কি জানিস, শুনলে তোরা হয়তো হাসবি। ওই বাড়িখানা ভাঙছে-ফাঙছে শুনে, আসতে ইচ্ছে হয় না।

হঠাৎ সবাই একটু মিইয়ে গেল। বললো,সে যা বললি। দেখে আমাদেরই বাবা রিদয়টা কেমন কেমন করে। আর অ্যাইসান শব্দ! উঃ! যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেছে, ফ্রন্টের গায়েই আছি আমরা। আর একটু থাকলেই টের পাবি, শুরু হয়ে যাবে বোমা ফাটা। সারাদিন ওই শব্দ। পাড়ার সবাই রাগের চোটে তোদের গাল পাড়ে। ইচ্ছে করলেই কিঞ্চিৎ রিপেয়ার করিয়ে নিয়ে হেসে খেলে আরো দশটি বছর কাটাতে পারতিস।

এ উজ্জ্বল সম্ভাবনাও অবশ্য রণুকে বিগলিত করে না। ক্রমশ যা হালচাল হয়ে এসেছিল, দশটা দিনও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। অথচ বাইরে খুব একটা নিদারুণ ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল না। অন্তত পুরুষ মহলে তো নয়ই।

আসলে যখনই কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করার সংকল্প স্থির হয়ে যায়, তখনি সেটা শবদেহে পরিণত হয়ে যায়। আর 'শবে'র মতো অসহিষ্ণুকর কী আছে ?

তবু শবদাহের ক্ষণে যে করুণ বিষণ্ণতা সেই বিষণ্ণতা রণুর ওই আজন্মের

পরিচিত বাড়িটার সম্পর্কে।

ভুবনবিজয়েরও হয়তো তাই।

মাঝে মাঝে নীহারকণা বলেন শোনা যায়, হ্যাঁগো, চিরদিনের চেনাজানা পড়শী, তাদের তো গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নটাও করা হলো না, তা এক আধবার দেখা করতে যেতেও তো পারো।

ভুবনবিজয় আলগাভাবে বলেন, গেলে হয়।

আসা আর হয় না।

লেবু বললো তোর অ্যাতো 'সেন্টিমেণ্টো'। তোর বড়দা আর নতুন কাকা তো ডেলি আসছে।

ডেলি আসছে! কেন? কী করতে?

লেবু হেসে হেসে বলে, কী করতে আর? কিছু মালপত্তর বাগাতে। সুপারভাইজারটার সঙ্গে বেশ আঁতাত করে নিয়েছে। সেই গাড়োয়ানটা বোধহয় ওনাদের পরিচয় পেয়ে লজ্জা পায়।

রণু অবাক হয়ে বলে, কিন্তু মালপত্তরটা কী?

কী নয়? পেরেকটা, স্ক্রুটা, জানলা দরজার কড়া-ফড়া, খিল ছিটকিনি, সাইজের কাঠ, লোহার ডাণ্ডা-ফাণ্ডা জলের কলের মাথা, আরো কত কী ওই প্রকাণ্ড বাড়িতে কত দিকে কত কি হরদমই তো নিয়ে যাচ্ছে। সেদিন তো দুটো ছোট জানলাই নিয়ে গেল।

রণুর হঠাৎ আর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। রণু যেন ইলেকট্রিকের শক্ খেয়েছে। কী নির্লজ্জতা! কী নীচ লোভ! যে জিনিস ছেড়ে চলে গিয়েছিস, নিঃস্বত্ব হয়ে বিকিয়ে দিয়েছিস আবার সেখানে ফিরে ফিরে এসে ভিখিরির মতো—ছিঃ ছিঃ। কী কুৎসিত দৈন্য।

ভাবল মানুষ কী পারে আর না পারে।

কীরে অমন ভটকা মেরে গেলি যে?

রণু লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে মুঠো করে চেপে ধরে বললো, না এমনি। রাত্রে ঘুমটা তেমন—

পরের বাড়ি ঘুমটা জুতের হয় না বাবা—

তপন হ্যা হ্যা করে হেসে বললো, বাদে শ্বশুর বাড়ি।

গাব্‌দা ঝাড়ছিস ক্যানো রে তপনা। তোর এক্সপিরিয়েন্স আছে ? যাক তোর লাট্টুর ওই কাকার বাড়ির কহানি একটু ক না বাবা শুনি।

আমার লাট্টু মানে ? উল্লুকের মতো কথা বলছিস কেন ?

লেবু মিটি মিটি হেসে বলে, ওই হলো আর কি ? চটছিস কেন ?

ঠিক এই সময় জগুর দোকান থেকে পুড়ে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া একটা কেটলী আর ক'টা সস্তামার্কা কাপ হাতে নিয়ে বদন এলো। বদনের হাফ প্যান্টের পায়ের আগা থেকে সুতো ঝুলছে, বদনের চিরকুট ময়লা গেঞ্জির পিঠে অসংখ্য ফুটো কিন্তু বদনের মুখে একমুখ হাসি।

রণদাবাবু! আর আসে না তো—

এই তো এলাম।

অ্যাতোদিন আসেন নাই।

চা খাওয়া হয়ে গেলে কাপগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে বদন।

কেন কে জানে ছেলেটার জন্যে ভারী মন কেমন করে উঠল রণুর। কই, রণু তো কোনোদিন ওর দিকে ভালো করে তাকিয়েও দেখে নি কখনো। নিজেরা আড্ডায় মশগুল থেকেছে। ও বেচারা নীরবে নিজ কর্তব্য সমাধা করে চলে গেছে। কোনোদিন বা দশ কুড়িটা পয়সা দিয়েছে এই নে অনেক খাটলি' বলে, বেশীর ভাগ দিনই নয়।

অথচ রণুকে দেখে ওর মুখে ফুটে উঠেছে একমুখ হাসি। অকৃত্রিম আন্তরিক। অহেতুক ভালবাসার বিনিময়ে কী দিতে পারি আমরা ?

রণু ভাবলো, এখানে যখন ছিলাম, ওকে তো অনায়াসেই নতুন গেঞ্জি প্যান্ট দিতে পারতাম। নিশ্চয় খুশী হতো। কোনোদিন মনে পড়ে নি।

আজকের চায়ের দামটা রণুর।

হিসেব করে দিয়ে দিলো রণু।

তারপর বদনের হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিলো একটা দু' টাকার নোট। বললো, অনেক খাটলি, নে !

বদন তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দোকানে কেটলী পেয়ালা নামিয়ে রেখে মুঠো খুলে দেখে অবাক হয়ে

গেল। হাতে কাগজের স্পর্শ পেয়েই বুঝেছিল, আজ আস্ত একটা টাকাই লাভ হয়ে গেল। বুকটা ভরে উঠেছিল। আহা রণদাবাবু বড় ভালো। কিন্তু দু' টাকার নোট দেখে ঘাবড়ে গেল। ভুল করে দিয়ে ফেলেছে। নোটটা একবার খুলে দেখল মুগ্ধ চোখে।

একসঙ্গে এতোটা বখশিস জীবনে পায় নি বদন। তবু ভুল করে দিয়ে ফেলাটা তো গাপ্ করে বসে থাকা যায় না। আবার মুঠো বন্ধ করে চলে এলো ছুটে।

রণদাবাবু চলে গেল?

এই তো গেল। এখনো বাসের রাস্তায়—

বললো, লেবু, কেন? চায়ের দামের হিসেবে ভুল হয়েছে বুঝি? কত কম হয়েছে? দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু বদন ততক্ষণে ছুটেছে বাসের রাস্তায়।

রণদাবাবু!

ফিরে দেখল রণু।

হাঁপাচ্ছে ছেলেটা।

কীরে?

বদন সসঙ্কোচে হাতের মুঠোটা খুলে বাড়িয়ে ধরে বললো, ভুলক্রেমে দু' টাকার নোটটা দিয়ে ফেলেছেন।

রণু আর একবার স্তব্ধ হলো।

তার চোখের সামনে একটা অদেখা দৃশ্য ভেসে উঠল, বড়দা আর নতুন কাকা ভাঙা বাড়ির মাল কুড়োচ্ছেন।

রণুর হঠাৎ চশমার কাঁচে ধুলো পড়ল।

রণু রুমাল বার করে চশমার কাঁচ মুছতে লাগল।

রণু তারপর বদনের খোঁচা খোঁচা চুলওলা হেঁড়ে মাথাটা ধরে নেড়ে দিয়ে বললো, ভুলক্রেমে কেন রে? ঠিকক্রেমেই দিয়েছি।

দু' টাকা!

বাঃ, কতদিন আসি নি, তোর পাওনা জমছিল না?

আহা বদনের তো এখন এ-কান ও-কান দাঁত বার করে হাসবার কথা।

হঠাৎ হাসতে ভুলে গেল কেন সে ? বদন ফট করে ঘাড় গুঁজে টিপ করে রাস্তার ওপর একটা গড় করে উল্টোমুখে হাঁটতে শুরু করল।

চশমার আড়াল নেই বলেই হয়তো উল্টোমুখো হতে হলো ওকে।

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রণু বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। কোনোখানে কিছু না, মনে পড়ে গেল হারাধন কাকাকে। যাকে রণুদের দল তামাসা করে বলতো 'কাকাদাদু'।

সিঁড়ির তলার ধারের সেই অন্ধকার অন্ধকার ঘরটা যেন চোখের উপর ভেসে উঠল।

ভিখিরির ন্যাকড়ার মতোই বেশবাস। বিছানাটা যে কবে কোনোদিন 'কী' ছিল বোঝা যায় না। দেখলে গা গুলিয়ে আসে। অথচ সদরে কর্তাদের বৈঠকখানা। তাঁদের এড়াতে হলে বালক কিশোর তরুণ দলকে এই সিঁড়ির তলার দরজা দিয়েই বেরোতে হয়।

পাছে হারাধনের গোচরীভূত হয়ে যায়, তাই রণুরা পা টিপে টিপে দরজাটা পার হতো। তবু এক একদিন পড়ে যেতে হতো খর্পরে। হারাধন যেন হাতে চাঁদ পাবার মতো বলে উঠতেন, অ দাদুরা অমন ছুট মেরে পালাচ্ছিস ক্যানো ? দাঁড়া না একটু দেখি। কতদিন দেখি না তোদের।

এই দাঁড়ানোর আবেদনটা যে একেবারে নির্মল, তা অবশ্য নয়। এরা সেটা জানে। দাঁড়ালেই তাঁর দুঃখের গাথা গেয়ে বসবেন।

ছারপোকার জ্বালায় রাতভোর ঘুম নাই ভাই, বাবাকে বলিস না একটু ওষুধ এনে দিতে। একখান চিরুনির অভাবে মাথাটায় উকুন জন্মে গেল। কোন্ জন্মের একখানা দাঁড়া ভাঙা চিরুনি চুল গেলে না। মাকে বলে একখানা চিরুনি এনে দিস না দাদু।

খোড়ো বাড়ির চালের মতো একমাথা চুল ছিল হারাধনের এই আশী বছরেও। যাত্রাদলের সাজা নারদের মতোও বলা চলে। তার কারণ নিত্য নাপিত খরচা কে দেয় ? বাড়ির লোক অবাক হয়ে যেত। খোদ কর্তাদের ভালো ভালো 'কেশ-তৈল' মেখেও মাথাজোড়া টাক, দিন দিন মাঠ ময়দান হয়ে যাচ্ছে, আর একছিটে সরষের তেলের অবদানে ওই আশী বছরের মাথায় চুল ধরে না। আর কিছু নয়, খাওয়ার গুণ। অত খেলে—

রণুর মনে পড়ল, একটা মানুষ একখানা চিরুনির অভাবে দুঃখ পাচ্ছে, এতে ভারী অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। কষ্ট কষ্ট ভাবও এসেছিল। শৌখিন নীহারকণার ঘরে ওসব জিনিসের অ-প্রাচুর্য ছিল না। শক্ত-পোক্ত এক-খানা মোটা চিরুনি নিয়ে এসে হারাধনকে দিয়েছিল সে। ওঃ এতে কী আহ্লাদ সেই বুড়োর।

তাঁর জানা জগতে যত আশীর্বাদ ছিল, সব তিনি উজাড় করেছিলেন রণুর ওপরে। ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, রণু রাজা হবে। মনের গুণেই ধন। বুঝলে দাদুভাই। তোমায় ভগবান মন দিয়েছেন। দুঃখীর দুঃখু বোঝো।

রণুর খুব অস্বস্তি হয়েছিল। পালিয়ে এসেছিল।

আর সেই বালক বয়েসেই বুঝতে পেরেছিল, এই আনন্দটা শুধু বস্তুর প্রাপ্তিতে নয়। যদিও রণুর নতুন কাকার ছেলে বিশ্ববিজয় হ্যা হ্যা করে হেসেছিল। এবার চুলের কেয়ারী করতে পারবে বুড়ো। তাই অ্যাতো আহ্লাদ।

কিন্তু রণু কি 'ভগবানের কাছে পাওয়া মন' এর কোনো সদ্ব্যবহার করেছিল আর?

রণু কি চেষ্টা করে একটু ছারপোকার ওষুধ যোগাড় করে এনে দিয়েছিল? রণু কি তারপরও পা টিপে টিপে ওই দরজাটা পার হতো না? অথচ এক-বার কী কাকাদাদু কী খবর? বললে কৃতকৃতার্থ হয়ে যেত বুড়োমানুষটা। মানুষটা কি এখনো বেঁচে আছে?

আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের আশপাশকে উপেক্ষা করে চলি। ভাবল রণু, যাকে ভালো লাগে তাকে ব্যতীত কার দিকেই বা তাকিয়ে দেখি? বেশী কথা কি, লাটুকে আমি এতো ইয়ে করি কিন্তু ওরই তো মা বিবো-পিসি। কবে ক'দিন তাকিয়ে দেখেছি তার দিকে?

বাস এলো একখানা, উঠে পড়ল রণু।

ভাবতে ভাবতে চলল, বিবোপিসি না বিবোপিসি। ছেলে-বুড়ো সকলের আহার আয়োজনেই সর্বদা ব্যাপৃত থাকতে হবে তাকে এটাই নিয়ম। অথচ গতকাল লাটুর কাকার বাড়িতে (বিবোপিসির ভাষায় 'তাঁর শ্বশুর-বাড়িতে') বিবোপিসিকে দেখে কী আশ্চর্য রকমের অবাক লাগল আর

ভালো লাগল। লজ্জাও করল যেন। কেমন চমৎকার ছিমছাম ঘরখানি বিবোপিসির। সুন্দর পর্দা ঝোলানো বাহারি গ্রীল বসানো জানলা··· মোজেক মেজের ঘরের দু'-দেয়ালে দু'খানা সরু খাট মা মেয়ের। ন্যায্যমত সাজ-সজ্জা বিবোপিসির খাটের মাথার কাছে একটা ছোট টেবিল, তার উপর ঢাকা বন্ধ কাঁচের জগ-এ জল, দু-তিনখানা বই। চশমার খাপ।

বিবোপিসি বই পড়তে জানে কিনা, সেটাই জানা ছিল না রণুর। আর এটাই কি জানতো রণু বিবোপিসি এতো সুন্দর দেখতে ?

ভবানীপুরের বাড়িতে বিবোপিসির ঘরটা মনে পড়ে গিয়েছিল কাল রণুর। যৌথ সংসারের যাবতীয় ফালতু মাল বিবোর ঘরে। এতোবড় ঘরখানা একা দখল করে আছে বিবো মাত্র একটা মেয়ে নিয়ে, এ অপচয় নিবারণের একমাত্র উপায় ওইটুকুই। অথচ যিনি ওকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিই ওই ঘরটায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ওকে। সেও তো তার সদ্য ভেঙে যাওয়া সংসারের 'খণ্ড'গুলো নিয়ে এসেছিল। বিভার সেই পালিশ চকচকে আসবাবগুলো ক্রমশই ধূলিধূসরিত হয়ে গিয়েছিল, তাদের উপরই ডাঁই করে করে চাপানো থাকতো সংসারের বাড়তি বিছানা, ভাঙা পুরনো বাক্স তোরঙ্গ, 'কাজকর্মের' সময় লাগবার বড়ো বড়ো বাসন বারকোষ, ঝুড়ি চুপড়ি ধামা কুলো। পুরনো পাঁজী খুঁজতে হলে ? দেখো সে বিবোর ঘরে। ভাঙা ছাতা, ফুটো বালতি, তাও থাকতে পারে একোণে-ওকোণে। সেই ঘরের মধ্যে বসে অবসর সময় বিবোপিসিকে বাড়ির নবাগত শিশুদের জন্যে কাঁথা বানাতে দেখেছে রণু, বানাতে দেখেছে দুটো কাঠি নিয়ে ছোট ছোট টুপি মোজা সোয়েটার। শিশুর যোগান তো অব্যাহত ধারায় বহেছে। গিন্নীদের শেষ হতে না হতেই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা মেয়েদের। তার পরে পরেই বাড়ির বৌদের। অবকাশ সময়ে বই পড়তে দেখে নি কখনো রণু বিবোপিসিকে।

বিবোপিসির 'শ্বশুরবাড়ি'র ঘর দেখে রণুর লজ্জা করেছিল, অথচ লজ্জা করবার কথা ওপক্ষেরই। রণুরা যখন সাহেব পাড়ার ওই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ছায়া ছায়া একটু রাত হতেই নিঝুম মেরে আসা রাস্তায় ঢুকেছিল, তখন লাট্টুকে বলেছিল, সাহেব পাড়ার থেকে আমাদের মফস্বলও ভালো রে

লাট্টু রাত বারোটায় বাড়ি ফিরলেওএমন অস্বস্তি হয় না। সারা রাতই রাস্তা জীবিত। এখানে ঢুকে নিজেকে চোর চোর মনে হচ্ছে। পাড়াটা ঘুমচ্ছে, না মরে পড়ে আছে ?

লাট্টু বললো, বাজে বোকো না তো চলো।

কুকুরটার কথা মনে আছে ?

আছে—

বলে লাট্টু ওকে প্রায় টেনেই নিয়ে এসেছিল অনেকগুলো কোয়ার্টার্সের মধ্যবর্তী কম্পাউণ্ডের মধ্যে। যেখানে বিরাট লনে, টেনিস কোর্ট, এদিকে ওদিকে ঘষা কাঁচের শেড্ ঢাকা সুদৃশ্য আলোকস্তম্ভ বসানো।

হঠাৎ সেই ঘুমন্তের অথবা মৃতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কুকুরের উচ্চধ্বনি। তার সঙ্গে নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার।

রণু চমকে উঠে লাট্টুকে ধাক্কাই মেরে বসেছিল।

কী হলো ? কাদের কুকুর ?

লাট্টু আশ্বস্থ গলায় বলেছিল, কাকার।

তাহলে ? ক্ষেপে কাউকে কামড়ায় নি তো ?

তুমিই ক্ষেপেছ। ওটা ওর আহ্লাদের ডাক। কাকী ফিরেছে দেখছি। আজ খেলায় হেরেছে।

এখান থেকেই বুঝতে পারছিস ?

পারব না কেন ? হেরে এলেই ওই রকম চেঁচায়। কাকাকে এমন যা-তা গালমন্দ করে কান পাতা যায় না।

এগিয়ে গিয়ে বেল টিপেছিল লাট্টু।

দারোয়ান দরজা খুলে সেলাম জানিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, ওরা ঢুকে গেছে। তারপর কাকীর জড়িতকণ্ঠের সেই ইংরিজি বাংলা মিশ্রিত সেই গালির স্রোত। লাভাস্রোত সমই।

সবই তো কানে এসে ঢুকেছিল রণুর।

ওদেরই তো লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, ওরা কিছুই লজ্জিত হয় নি।

বিবোপিসি হেসে হেসে বলেছিল, যেদিন বেশী পয়সা হারে, সেদিন বেশী

পয়সা খরচা করে মেমসাহেব।

হেসেই।

লাট্টুও বলেছিল, যাক প্রথম দিনেই আদ্যোপান্ত দেখে নিলে রণুদা।

আর আরো মজা, চলে আসার সময় স্বয়ং কে. এন. রায় বিভার ঘরে এসে বসে পড়ে হেসে বলেছিলেন কীহে? এসে কী মনে হচ্ছে? পিসি একখানা জু গার্ডেনে এসে পড়েছে?

তখন অবশ্য চেঁচামেচিটা ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল।

লাট্টু বলেছিল, আজ আর খাবে-টাবে না, বাইরের পোশাক সুদ্ধুই এবার বিছানায় গড়িয়ে পড়বে।

তবে কাকী একটা উপকার করেছিল।

এই সব গোলমালে লাট্টুর ফেরার দেরি নিয়ে অধিক কথা গড়াল না।

রণু বললো, চেনো তো নীহারকণা দেবীকে? না খাইয়ে দাইয়ে ছাড়বেন? নিন্দের ভয় নেই?

আঃ এই দুষ্টু ছেলেটা চিরকাল একরকম রয়ে গেল। নিন্দের ভয় কেন? ভালবেসে নয় কেন?

আহা সেটা অবশ্যই আছে। তবে ওটাও কম নয়।

তারপর বিভা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন বাড়ি হয়েছে, ক'খানা ঘর, কাজ করবার লোক পাওয়া গেছে কিনা। কে রাঁধে, রান্নাঘরে তাক আলমারি সব করিয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রণু হেসে বলেছিল, এখন কিন্তু তোমায় দেখে মনে হচ্ছে না পিসি ওই জগতটা তোমার মনে আছে। ওইসব কয়লা ঘুঁটে, খুন্তি হাতা উনুন হাঁড়ি।

বিভা হেসে বললো, যা বলেছিস। প্রথমটা যেন জলের মাছ ডাঙায়। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে গেছে, ওদিকের বারান্দায় একটা স্টোভ জ্বেলে নিজের জন্যে রাঁধি, আর সাহেব ছাওরকে সুক্ত মোচার ঘন্টর ভোগ খাইয়ে মোহিত করি। মাঝে মাঝেই ওর পুরনো কথা মনে পড়ে যায়, বলে, আর একটা যে কি করতে তুমি, আলুর সঙ্গে কি মাখানো গুঁড়ো গুঁড়ো, ভীষণ ভালো লাগতো। মনে আছে ছেলেবেলায় ভীষণ ভালবাসতো ও পোস্ত চচ্চড়ি। যেই বলেছি কী খুশী। ছেলেমানুষের মতন হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

ঠিক ঠিক। এমন হয় এক একসময়। আগের মতো 'কানু' 'তুই' বলে খসি। তাতেও খুশী। বলে, এ পৃথিবীতে যে এখনো আমায় 'তুই' বলে কথা বলবার মতো কেউ আছে, দেখে দারুণ ভালো লাগছে।

আসার সময় বিবোপিসি বলেছিল, আবার আসিস।

লাট্টু বলেছিল, হ্যাঁ, আবার আসতে যাচ্ছে। ওর যা কুকুরের ভয়।

আর লাট্টুর কাকা কান্তিনাথ বলে উঠেছিল, কী আশ্চর্য! ইয়ংম্যান। তারপর বলেছিল, এসে দেখো, ঠিক ভাব করে নেবে তোমার সঙ্গে। আচ্ছা অনু, তোমার দাদাকে তো একদিন লাঞ্চে ডাকতে পারো। এই সামনের রবিবারে। কি নাম যেন বললে? রণু, হ্যাঁ রণু। সামনের রবিবার চলে এসো কি বল? এখানে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে। অনিন্দিতা, ভালো করে বলে দাও তোমার দাদাকে।

সিঁড়ির সামনে পর্যন্ত এসেছিল ভদ্রলোক।

ধবধবে পায়জামা পরা আর ততোধিক ধবধবে হাত-কাটা গেঞ্জি গায়ে। মাজা মাজা শ্যামলা রং সুগঠিত দেহ। গলার স্বর ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত। আভিজাত্যের মসৃণতার সঙ্গে মেপে-জুপে কথা বলার একটি বিশেষ ভঙ্গী। থেমে থেমে কেটে-ছেঁটে। অথচ খুব কৃত্রিম বলেও মনে হলো না।

লাট্টুর এখানের নাম অনু।

অনিন্দিতা থেকে অনু।

সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছিল লাট্টু।

রণু বলেছিল, 'অনু' নামটা তোকে আদৌ মানায় না, মনে হয় অন্য লোক।

যা বলেছ। আমারও তাই মনে হয়। তাহলে আসছ তো রবিবারে?

কি? ওই কে. এন. রায়ের সঙ্গে লাঞ্চ করতে? মাথা খারাপ!

লাট্টু বললো, আর একবার বেশ দেখা হয়ে যেতো।

তার জন্যে অন্য পন্থা আবিষ্কার করা যায়।

হ্যাঁ যেমন এই অ্যাতোদিন করেছিলে।

রণু দু সিঁড়ি নেমে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আসতে পারি, যদি তুই সেদিন— বিবোপিসির কাছে প্রস্তাবটা তোলায় রাজী থাকিস।

সেই এক কথা। থাক তোমায় আসতে হবে না।

বলে রাগ করে সিঁড়িতে উঠে গিয়েছিল লাট্টু।

বাস চলার সঙ্গে-সঙ্গে—

গতরাত্রের সেই কথাগুলো ভেবে চলছিল রণু। শুধু গতরাত্রের কেন, কাল সকাল থেকেই কত অভাবিত ঘটনা প্রবাহ। অনেক দিন পরে আচমকা লাট্টুকে দেখে যেন ভয়ানক একটা উল্টো-পাল্টা কিছু করতে ইচ্ছে করে গেল। কিন্তু লাট্টুর তো কেবলই অস্বস্তি। আর কী যে অনড় সংস্কারের জেদ। কেবলই বলে চলেছে 'যা হয় না, তা নিয়ে ভেবে লাভ কী?' এ-যুগে যে অনেক কিছুই হয়, তা মানতে পারছে না। অথচ এমন বাড়িতে থাকাটা হাস্যবদনে মেনে নিতে পারছে, যে বাড়ির গৃহিণী জুয়ায় হেরে মদ খেয়ে রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে মাতলামি করে।

একবার শুধু বলেছিল, এখনো তো স্টুডেন্ট, এখন এসব শখ কী? কে অ্যালাউ করবে?

রণু বলেছিল, 'বুক্' করে রাখতে চাই। নইলে কে কখন লুঠ করে নিতে আসবে।

লাট্টু বলেছিল অতো সোজা নয়।

হঠাৎ চমকে উঠল রণু।

আরে এ কোন্ দিকে আসছে সে? একদম বাড়ির উল্টোমুখো। তার মানে অন্যমনস্ক হয়ে ভুল বাসে চড়ে বসেছিল। সেরেছে। স্টপেজ আসতেই নেমে পড়ল। ভেবে দেখবে এখন কী কর্তব্য। কিন্তু নেমেই দেখল সামনেই শেয়ালদার গাছ-গাছালির বাজার। ইস! বৌদির দেওয়া সেই লিস্টটা এ প্যান্টের পকেটে নেই। এখান থেকেও তো সবই পাওয়া যেতে পারতো।

একটু ভাবল। দেখল পকেটে টাকা কিছু রয়েছে।

আচ্ছা লিস্টেরই বা আছে কি? কোন্ ফুলটারই বা নাম জানে না সে? গোলাপ বেল জুঁই ডালিয়া আরো সব কী যেন। আচ্ছা ওদের জিজ্ঞেস করে নিলে হবে। হ্যাঁ রজনীগন্ধা রজনীগন্ধা। কোন্ সময় কোন্ গাছ হয়? মানে কখন পুঁততে হয়?

তা সেও বোধহয় ওরাই বলে দেবে। ওই গাছওলাদের দিকে এগিয়ে গেল রণু। রণুর মনটা হঠাৎ আশ্চর্য রকমের ভালো হয়ে গেল।

১০

এ বাড়িতে প্রতীক্ষার রাতটা একটু শান্তির।

শুতে আসবার সময় যখন সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে ঘরে এসে বসে প্রতীক্ষা, ওর মনে হয় যেন একটা অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এলো। ও বাড়িতে সব সময়ই ছিল পাথরচাপা, নিজেকে কবরের শব বলে মনে হতো, এখানে ঠিক তেমন নয়। তবু মনে হয় কে যেন কোন্ অলক্ষ্য রজ্জুতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে প্রতীক্ষাকে।

কিন্তু কেন?

নীহারকণা কি তাঁর বড়জায়ের মতো সিংহবাহিনী? নীহারকণা কি সেকালের মতো বধূনিপীড়নকারিণী শাশুড়ী? তা তো নয়। হরদম কথা বলা, সব কথায় কথা বলা, আর সব ব্যাপারে অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসা ছাড়া আর কি এমন দোষ আছে নীহারকণার?

হ্যাঁ ওইটাই আছে। হয়তো কিঞ্চিৎ বেশীমাত্রায় আছে।

প্রতীক্ষা যদি কখনো রণুর সঙ্গে কোনো বইয়ের কি কোনো সিনেমার অথবা রেডিও প্রোগ্রামের দুঃসহতার বিষয়ে আলোচনা সমালোচনা করতে বসে, কিংবা ছাত্রী জীবনের সুখ দুঃখের গল্প করে (এখন অবশ্য তার মনে হয় সেই জীবনটাই ছিল দুঃখহীন অনাবিল সুখের) কোথা থেকে না কোথা থেকে নীহারকণা এসে উদিত হন, কী এতো গল্প হচ্ছেরে দ্যাওর ভাজে? কিসের কথা?

'কিসের কথা' সেটি আদ্যোপান্ত না শুনে ছাড়বেন না। 'এ আর উনি কী বুঝবেন' ভেবে গোঁজামিল দেবার জো নেই।

কখনো কখনো খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ডেকে ওঠেন ভুবনবিজয়, বৌমা বৌমা, দেখো কাণ্ড। বুড়ো বুড়ো নেতারা সব কী খোকামি করছে। নয় তো—আরে শোনো শোনো আজকের এডিটোরিয়ালে কী বলেছে, অথবা খেলার খবরও।

প্রতীক্ষা হাসি হাসি মুখে এসে দাঁড়ায়।

তার মনে পড়ে যায় বাবাও এই রকম কাগজ পড়তে পড়তে ডেকে উঠতেন, 'পিতু, আজকের খবর দেখেছিস? আজকের তির্যক দেখেছিস?'

প্রথম প্রথম ছেলের বৌকে নাম ধরে ডাকতে চেষ্টা করেছিলেন ভুবন-বিজয়। কিন্তু নীহারকণার আপত্তিতে টেঁকে নি। তাঁর মতে ওতে নাকি শ্বশুর-শাশুড়ীর মান থাকে না। বৌমাই ঠিক। সে যাক, ডাক শুনলেই বৌয়ের আগে নীহারকণাই ছুটে আসবেন, কী হলো? কী লিখেছে কাগজে? বৌকে এতো ডাক পাড়াপাড়ি?

তখন ভুবনবিজয়কে নিতে হয় 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনমের' দায়। অত-এব সেই আগ্রহটা যায় জুড়িয়ে এবং বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রতীক্ষাকে।

এগুলো অবশ্য প্রতীক্ষার ছুটিকালীন ব্যাপার। নইলে ভোরেই তো বেরিয়ে যায়।

তবে স্কুলে তো ছুটি বিস্তর।

আর এক অসুবিধে সমরবিজয় যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। তখন হয়তো তার হাতে কিছু না কিছু সওদা থাকেই। সে সওদার প্যাকেট খুলে নীহারকণাকে না দেখিয়ে ঘরে ঢোকবার উপায় নেই সমরের।

ছেলেমানুষের মতো হাসি হাসি মুখে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, কী এতো আনলি রে? দেখি?

'ও কিছু নয়' বললে তো আর ছাড়বেন না নীহারকণা? খোলাবেন, দেখ-বেন, প্রতিটি জিনিসের দাম জেনে নেবেন, দাম বেশীর জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করবেন, তবে ছুটি বেচারী ছেলেটার।

এসব জিনিস হয়তো প্রতীক্ষার অনুরোধের কোনো বই, হয়তো বা নিতান্তই প্রয়োজনীয় তেল সাবান এটা-ওটা। প্যাকেট খোলা সেই জিনিসগুলো যে কেন প্রতীক্ষার কাছে একেবারে মূল্যহীন হয়ে যায়, কে জানে। হাতে নিতেই ইচ্ছে হয় না, বলতেই হবে প্রতীক্ষারই মনের গড়নের দোষ।

সব থেকে খারাপ লাগে কল্যাণী থেকে কোনো চিঠি এলেই নীহারকণাকে হাসি হাসি মুখে ছুটে আসতে দেখে। কে চিঠি দিয়েছে গো? মা না বাবা।

বেশীর ভাগ চিঠিই তো দেখি বাবার ? মা বুঝি ভালবাসে না মেয়েকে ?

প্রতীক্ষা তাকিয়ে দেখতে পারে না, তবু প্রতীক্ষা অনুভব করে কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো চুলে ঘেরা ফর্সা ধবধবে ভারী ভারী গোল মুখখানা কৌতুক কৌতূহল আর চালাকির হাসিতে কেমন যেন টোল খাওয়া হয়ে গেছে।

প্রতীক্ষার বুকটা হিম হয়ে আসে। জানে শুধু কার চিঠি সেটা বললেই চলবে না। সঙ্গে সঙ্গেই আরো সরলতার ছবি হয়ে বলে উঠবেন উনি, কই দেখি কী লিখেছেন বাবা ? একটু পড়ো শুনি। এতো চিঠিও লিখতে পারেন বাবা ! পড়ো গো।

'পড়ব না' একথা কি বলা যায় ?

বড় জোর বলা যায়, কী আর লিখবেন ? এই এমনি কেমন আছি-টাছি, ইস্কুলটা কেমন লাগছে—।

কিন্তু এতে কি নিবৃত্ত করা যায় নীহারকণা দেবী নামের মহিলাটিকে ?

তবু—

আইনে কি একে 'অত্যাচার' বলবে ? 'নিপীড়ন' বলবে ? 'নির্যাতন' বলবে ? নিশ্চয়ই না। তিনি যদি সেই চিঠিলব্ধ খবরটি জনে জনে বলেই বেড়ান, তাতেই বা কী ? রেগে-টেগে তো আর বলেন না। হেসে হেসেই বলেন, বৌমার বাবা মেয়েকে চিঠি লিখতে বসে কা সব দিয়ে পাতা ভরায় শুনবে ? 'আজ পাঁচিলের ধারের কাঠচাঁপা গাছটায় এগারোটা ফুল ফুটেছিল, কাল বিকেলে আমাদের বারান্দার রেলিঙে একটা অদ্ভুত পাখি এসে বসেছিল। টিয়ার মতো ধরন কিন্তু ঠিক টিয়াও নয়। গায়ের রং নীলচে।'

'রবিবার দিন এখানে একটা গানের আসর হয়ে গেল, একজন এমন চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন ! অথচ মোটেই তেমন নামকরা নয়।' আবোল-তাবোল আর কাকে বলে ?

তা হলেও একে কি আর অক্টোপাশের বাঁধন ভাবা উচিত ? কত ভয়ানক ভয়ানক শাশুড়ী থাকে সংসারে।

একটা ব্যাপারে তো বাপু নীহারকণা নীরব থাকেন।

প্রতীক্ষার স্কুলের ব্যাপারে। এ প্রসঙ্গে সযত্নে পরিহার করে চলেন নীহার-

কণা। কী যে সেখানে করতে যায় প্রতীক্ষা, কিবা করে আসে এ বিষয়ে যেন নীহারকণা একেবারেই অনবহিত। একটি প্রশ্ন নেই সে সম্বন্ধে। যেন নিত্য সকালে প্রতীক্ষা ফর্সা শাড়ি জামা পরেও কোথাও বেড়াতে যায়, বেড়িয়ে ফেরে।

ভুবনবিজয় কখনো বলেন, ও-পাড়া ছাড়ার ব্যবস্থা তো অনেক দিনই চলছিল, ও-পাড়ার স্কুলের কাজটা চট করে না নিলেই হতো বৌমা। রোজ এতোখানি রাস্তা ঠেঙানো। বাস বদল। মজুরি পোষায় না। বাসের আজকাল যা অবস্থা।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে না কোথা থেকে নীহারকণার মন্তব্য শোনা যায়, যতই বল বাপু পথে বেরোলেই গায়ে হাওয়া লাগে। সকাল থেকে উনুন পাড়ে বসে সেদ্ধ হওয়ার থেকে ঢের ভালো। কি বল বৌমা? হ্যা-হা-হা।

হেসেই মাত করেন হ্যা-হ্যা করে।

তা এটাও তো সুখের।

কেমন করে পড়াও, অন্য দিদিমণিরা কী বলে, তাদের সঙ্গে ভাব আছে না ঝগড়া, এসব প্রশ্ন তো শুনতে হয় না প্রতীক্ষাকে? সেটাই কি কম লাভ?

তবু প্রতীক্ষা রাত্রে যখন, নিচের তলার সব কাজ মিটিয়ে (রণুর জন্যে প্রায়ই বেশী রাত অবধি বসে থাকতে হয়। কারণ সকালবেলা প্রতীক্ষা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে আসে বলে, বিকেল রাত্রের দায়টা তার উপর থাকে) দোতলায় উঠে এসে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে বসে। প্রতীক্ষার মনে হয় সে যেন অন্য এক জগতে এসে পৌঁছে গেল।

বাড়িতে আপাতত দোতলায় শুধু একখানাই ঘর তোলা হয়েছে। বাকিটা খোলা ন্যাড়া ছাত পড়ে আছে। অবস্থা সাপেক্ষে বাকি দুটো হবে। নিচতলার সমান সমান।

নীহারকণার হাঁটু বাদী, তাই, বাধ্য হয়েই ওই স্বর্গীয় ঘরখানা ছেলে বৌকেই দিতে হয়েছে। লোককে বলতে অবশ্য বাহুল্যবোধে দুটো শব্দ ব্যবহার করেন না নীহারকণা, শুধু 'বৌ'-ই বলেন। বলেন, বৌমা হাওয়া হাওয়া করে পাগল, তাই হাওয়াদার ঘরখানা ওকেই দিয়েছি।

'দিয়েছি' শব্দটায় বেশ চাপ থাকে।

প্রথমটায় অবশ্য বলেছিলেন, তেশূন্যে একখানা ঘর, ওটা রণুর পক্ষেই সুবিধে। চোদ্দবার নামা ওঠায় বৌমার কষ্ট—

কিন্তু রণু মাকে ধূলিসাৎ করে ছাড়ল।

বললো, পরের মেয়ের ওপর দরদ না করে নিজের ছেলেটার ওপর একটু কর বাবা। বাইরে বেরোবার দরজার পাশের ঘরটায় আমার 'পালঙ্ক'টি বিছিয়ে রাখো, যাতে তোমাদের অজান্তে টুক করে বেরোতে ঢুকতে পারি। তেশূন্যে রণু শুতে যাক। কী স্নেহময়ী জননী আমার।

অতএব প্রতীক্ষার ভাগ্যেই জুটেছে ওই ছাতের ঘরটা। নীহারকণার আওতার বাইরে একটু ঠাঁই। সে যে পরমপ্রাপ্তি। অবশ্য সে প্রাপ্তিযোগের স্বাদটুকু রাত্রেই জোটে। দিনের বেলা নয়। ঘরটাই দিয়েছেন নীহারকণা, খোলা ছাতটা নয়। সেখানে তাঁর 'নিজ ভুবন'।

নিজে বেশীবার সিঁড়ি ভাঙতে পারেন না, বাসনমাজা মেয়েটাকে পয়সা খাইয়ে অনেক কিছু আনিয়ে নিয়ে, ছাত ভরে শুকোতে দিয়ে রাখেন কয়লার গুঁড়োর গুল, কুড়নো গোবরের ঘুঁটে, পোড়া কয়লা, চ্যালাকাঠ, বাঁশ বাখারির টুকরো, ডাবের খোলা, নারকেলের মালা। এই ঐশ্বর্যের তদারকিতে মরে মরেও এক আধবার উঠে আসেন নীহারকণা। কাজেই দুপুরের বিশ্রামটাতেও শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয়।

প্রতীক্ষা ভেবে পায় না জ্বালানি বস্তুটা এতো লাগে কেন তাদের? কিসে লাগে? যদিই লাগে, ছাড়া যায় না? স্টোভেও তো রান্না হয়। তার মা তো বরাবর সব কিছুই স্টোভে—কিন্তু থাক সে-কথা। বিয়ে হয়ে পর্যন্ত এদের বাড়িতে দেখেছে প্রতীক্ষা দৈনন্দিনের জীবনটাকে কে কতখানি ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে, যেন তারই প্রতিযোগিতা এদের। যেন সেটাই এদের জীবন সাধনা।

তা সেই ও বাড়িটা না হয় নিজেই মস্ত ভারী ছিল। বরাবরের খাতে প্রবাহিত জীবনচর্চাকে অন্য খাতে বওয়াবার দিক ছিল না। কিন্তু এ বাড়িটা তো ছবির মতো। আধুনিক প্ল্যানে গড়া হালকা ছাঁদের।

বাড়ি হওয়ার শুরু থেকেই প্রতীক্ষার আশা ছিল, নীহারকণার খাটুনী

যতটা সম্ভব লাঘব করে দেবে সে। শুধু কর্তব্য হিসেবেও নয়, ধারণা জন্মে গিয়েছিল, তাতে ভুবনবিজয় নামের মানুষটাকে খুশী রাখা যাবে। খুশী স্বভাবের মানুষকে খুশী রাখতেই ভালো লাগে। আশা করেছিল জীবনটাকে কত হালকা করে নেওয়া যায়, সংসারকে কত সহজ করে নেওয়া যায়, তা সবাইকে দেখিয়ে দেবে প্রতীক্ষা। কিন্তু হলো না। আর সে আশা পোষণ করে না।

নিজের নিয়মের এতটুকু এদিক ওদিক বরদাস্ত করতে রাজী নয় নীহারকণা নামের ওই সদা হাস্যবদনী মহিলা।

প্রতীক্ষা যখন বলেছে, সকালে তো একা আপনাকেই সব সামলাতে হয় মা। এবেলাটা ছেড়ে দিন, চুপচাপ আরাম্‌ করুন বসে। দেখবেন স্টোভেই সব হয়ে যাবে। বরং গরম-গরম খাওয়া চলবে।

নীহারকণা হেসে হেসেই বলেছেন, তোমার এক অনাছিষ্টি কথা বৌমা। একটা পুরো গেরস্তর রান্না, এ স্টোভে হবে কি গো? শাশুড়ীকে আরাম করাতে ইচ্ছে হয়েছে, করো সব একলা হাতে। তবে তুগ্‌গতি করে কেন? উনুন জ্বেলে সময়ে সেরে নাও।

বলে নিজেই অনেক তরিবৎ করে একটি উনুন ধরিয়ে দিয়ে, বৌয়ের সুবিধে করে দিয়ে যান। এবং সেই সময়টি প্রায়শই নির্বাচন করেন ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কাল। যে সময়টায় প্রতীক্ষা গা'টা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বই নিয়ে বসতে যায়, পরবর্তী দিনের ক্লাসের পড়ানোর পড়াটা ঠিক করে রাখতে যায়, হয়তো বা ছাতে উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের পাঁচিলটার ধারে দাঁড়াতে যায়, সমরকে বাস থেকে নামতে দেখার অর্থহীন সুখটুকু পেতে।

গন্‌গন্‌ করে ধোঁয়া বেরনো উনুনটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবলেশহীন মুখে ময়দা মাখতে বসে প্রতীক্ষা।

প্রথম দিকে—

ছেলেরা ঘোষণা করেছিল নতুন বাড়িতে ধোঁয়া চলবে না। কর্তারও সমর্থন ছিল তাতে। তবু সে ঘোষণা নস্যাৎ হয়ে গেল।

যাবে না?

গেরস্ত বাড়িতে সকাল সন্ধে উনুনের ধোঁয়া উঠবে না? একী অলক্ষুণে

কথা ? লোকে গাল দিতে বলে, 'তোর হেঁসেলে যেন চুলো না জ্বলে।' শখে স্বেচ্ছায় সেটা করতে হবে ? ইচ্ছে হয় কোরো ! নীহারকণা মরলে। বেঁচে থাকতে নয়। এর পর আর কর্তা তাড়াতাড়ি তাঁর সমর্থন সংবরণ করে নেবেন না এমন তো হতে পারে না ? ছেলেরাও হাল ছেড়ে দাবি ছেড়ে দিলো। প্রতীক্ষারই বা আর কি দরকার গো ?

নীহারকণার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তো আর দিন গুনতে পারে না সে ?···

অতএব নীহারকণার হাতের রাজ্যপাট বজায় রইল।

সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না প্রতীক্ষার।

সিঁড়ির দরজা বন্ধ করার নিয়ম চোরের ভয়ে। নিরাপত্তার জন্যে।

প্রতীক্ষা এই ব্যবস্থাটার জন্যে কৃতজ্ঞ।

চোরেদের লাভ লোকসানের কথা ভগবান জানেন, তবে প্রতীক্ষার এটা মস্ত লাভ।

প্রতীক্ষা তাই ওই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বুক ভরে একটা নিশ্বাস নেয়। এ নিশ্বাস কিসের ? শুধু আরামের ? নাকি এখন আর শোবার ঘরের বাইরে কারো কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকবার সুযোগ পাবে না শুধু এই নিশ্চিন্ততায় ?

মাঝে মাঝে ভাবে প্রতীক্ষা, আচ্ছা, ভুবনবিজয় কি খুব বোকা ? ভুবনবিজয় কি এসব বুঝতে পারে না ? পারলে, ওই মহিলাতে এতো তদ্গত হন কী করে ? তিনি তো এমন রুচিহীন মানুষ নন।

প্রতীক্ষার তো মনে হয়, রুচির অমিলই হচ্ছে—জগতে সব থেকে বড় অমিল। আর সেই অমিলের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে বাধ্য হওয়ার মতো বড় যন্ত্রণা আর নেই। ভুবনবিজয়ের মুখে সেই যন্ত্রণার ছাপ কোথায় ? ভুবনবিজয় তো সর্বদা খুশীতেই থাকেন। আর যখনই ওই গাবদা-গোবদা ফর্সা মুখখানির দিকে তাকান খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠেন। আগে এতোটা ধরা পড়ত না। পাঁচজনের বাড়ি। এখন সর্বদা। এটা যে কী করে হয়— প্রতীক্ষার বুদ্ধির অগম্য। ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা এখন আর করেও না। শুধু ওই খোলামেলা স্বভাব, বই বাতিক, খবরের কাগজের নেশাগ্রস্ত, আর নাকি একদার নাটক-পাগল লোকটাকে প্রতীক্ষা একটু সম্ভ্রম ভাল-

বাসার চক্ষে দেখে বলেই, ওকে এই দুর্বোধ্যটা কখনো কখনো ক্লিষ্ট করে তাকে।

১১

সমর একটু আগে খেয়ে এসে শুয়ে পড়েছে।

বই-টই পড়ার ঝোঁক তার নেই। জানে প্রতীক্ষার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে কিছুক্ষণ, নীহারকণা নিজকক্ষে প্রবেশ না-করা পর্যন্ত প্রতীক্ষা নিজ-কক্ষের দিকে পা বাড়াবে না, তবু একটা বই ধরে না, এমনিই শুয়ে থাকে। নয়তো তার যে একটা হিসেবের খাতা আছে, যা প্রতীক্ষাকেও দেখতে দেয় না, সেইটা নিয়ে আঁকিবুঁকি করে।

আজ কিছু করছিল না।

প্রতীক্ষা ঘরে ঢুকেই একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে, আলোটা নিভিয়ে দিলো। আর জানলার পর্দাগুলো দিলো সরিয়ে। সরাবার দরকার যে খুব ছিল তা নয়, এতো বেদম উড়ছিল ওই হালকা পর্দাগুলো যে, থাকা না-থাকা সমান।

তবু ঘরে ঢুকেই আলো নেভানোয় বোধকরি সমরের চিত্ত প্রত্যাশায় উদ্বেল হয়ে উঠল। ব্যগ্র গলায় বলে উঠল, বাঁচা গেল। চোখে ফুটছিল। এসো শুয়ে পড়।···

প্রতীক্ষা বললো, রোসো একটু বাইরেটা দেখি। অদ্ভুত সুন্দর চাঁদের আলো আজ।

সমরের খেয়াল হলো, সুইচ অন করা সত্ত্বেও ঘর অন্ধকার হয়ে যায়নি।···

বিদ্রূপের গলায় বললো, ওঃ! চাঁদের আলো।

এটা সমরের স্বভাবগত।

প্রতীক্ষার এই প্রকৃতি-প্রেমী মনটা নিয়ে বিদ্রূপ হাসি হাসা। তাচ্ছিল্য হয়তো নয়, কৌতুকই, তবু কখনো কখনো প্রতীক্ষা যেন মিইয়ে যায়।··· অভিমানাহত হয়।

রণুও হরদম ঠাট্টা করে, কিন্তু তার কথায় যথেষ্ট ধার, তবু ভার নেই।

সমর স্বভাবতই স্বল্পভাষী, আত্মস্থ যেন একটু বয়স্ক টাইপের, তাই তার কথায় ধার না থাকলেও ভার আছে।

প্রতীক্ষা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, ঠাট্টার কিছু নেই। চাঁদের আলোর রীতিমতো একটা বাজার দর আছে।

এই 'বাজার দর' শব্দটা আবার সমরকে ঠাট্টা।

সমর খবরের কাগজ উলটে-পালটে শুধু ওই 'বাজার দর'টাই মন দিয়ে দেখে।

সমর বললো ছিল, এখন আর নেই। এখন সমরের মনটা খুব ভালো। তাই কথাও বলছে কিছু।

কেন? চাঁদে মানুষের পতাকা উড়েছে বলেই কি তার আলোর মাধুর্য কমে গেছে? বললো প্রতীক্ষা।

মাধুর্যর কথা জানি না, মাহাত্ম্য কমে গেছেই। এ যুগে আর কেউ বলে উঠবে না, 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি, সেও ভালো—'

প্রতীক্ষা একটু হাসল। বললো, কে বলেছে তোমায়, কেউ বলবে না? আমিই তো বলছি। ঠিক এক্ষুনি ওই কথাটাই মনে এসে গিয়েছিল।

সর্বনাশ। এক্ষুনি জানলা বন্ধ করে দাও।

কেন, সত্যি মরছি?

সমর বললো, কী বলা যায়? কাবদের বিশ্বাস নেই। পালিয়ে এসো! পালিয়ে এসো।

প্রতীক্ষাকে সমর 'কবি' বলে ঠাট্টা করে।

এখন প্রতীক্ষা সরে এসে খাটের ধারে বসল। মাথার বালিশটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, বিনা খাটুনিতেই আমার একটা ডিগ্রী লাভ হয়েছে। কবিতা না লিখেই কবি। যাক, এখন একটু কাজের কথা শোনো—

কাজের কথা? তুমি আবার কাজের কথাও কইতে জানো?

আহা! না, না, শোনো। আচ্ছা, বিবোপিসী তোমাদের কী রকম পিসী?

সমর আকাশ থেকে পড়ল।

এমন অদ্ভুত একটা প্রশ্নের কথা ভাবতেই পারে নি সে। বললো, এই

তোমার কাজের কথা ?

মশাই, কাহিনী ক্রমশ প্রকাশ্য। আগে এ প্রশ্নটার উত্তুর দাও।

সমর বললো, এটা মাকে জিগ্যেস করলেই ভালো হতো। এটা তো তাঁরই ডিপার্টমেন্ট।

কেন, তুমি জানো না ?

জানি, আবার হয়তো জানিও না। উত্তরটা ভুল হতে পারে।

তার মানে খুব নিকট নয় ?

তা তো নয়ই। শুনেছি ঠাকুর্দার বাবার মহানুভবতার ব্যাপার—কিন্তু হঠাৎ এটা নিয়ে টনক নড়ল কেন ?

ভাবছিলাম—রণুর সঙ্গে লাট্টুর বিয়ে হতে পারে কিনা—

অ্যাঁ।

সমর শুয়েছিল, উঠে বসল। বললো, অধিক চাঁদের আলোয় মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

প্রতীক্ষা একটু জোর দিয়ে বললো, যদি সম্বন্ধে না বাধে, মাথাটা খারাপ কিসে ?

সমর গম্ভীর হলো। বললো, সম্বন্ধে না বাধুক, সভ্যতায় বাধে।

এ রকম কথায় প্রতীক্ষার চুপ করে যাবার কথা। সামান্যতেই তো সে আহত হয়ে যায়। কিন্তু আজ বোধ করি সে একটু বেশী প্রস্তুত হয়ে ফ্রন্টে নেমেছে। তাই গলাটা দুর্বল শোনালেও জোর দিয়ে বলে, বাঃ। এ রকম হয় না বুঝি ?

হয় অনেক রকমই। আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকের ভাই তো ভাগ্নীকে বিয়ে করেছে। নিজের দিদির মেয়ে।

সেটা আর এটা এক হলো ?

কি হলো না হলো জানি না। কিন্তু এ নিয়ে আবার তোমার মাথাব্যথা কেন ?

কেন আবার ! দেখলেই মনে হয় দু'জনকে বেশ মানায়। তাই বলছি—

ওঃ। ঘটকালি ধরেছ ?

তা সেটাও বলতে পারো—

প্রতীক্ষা মনের জোর করে বলে, মনে হয়, দু'জনের মধ্যে বেশ ভাবও আছে।

ভাব ! অর্থাৎ 'প্রেম'। থামো। সংসারটা তোমাদের গল্প উপন্যাস নয় !

প্রতীক্ষা ভাবল চুপ করে যাই ! তবু প্রায় মরীয়া হয়ে বলে উঠল, আর গল্প উপন্যাস যদি নিজেই সংসারের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে ?

পড়ে পড়বে। চুলোয় যাবে ' তোমার ও-নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

এর পর আর কি বলতে পারে প্রতীক্ষা ?

আচ্ছা, প্রতীক্ষা কি সত্যিই ভেবেছিল, সমর ওর কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে প্রতীক্ষার সাথে সহযোগিতা করতে আসবে? না, অতোটা পরিষ্কার আশা ছিল না। শুধু একটুখানি মূঢ় প্রত্যাশা। যদি সম্পর্কের বাধাটা ততো তীব্র নয় বুঝতে পারলে, সমর ওই দুটো ছেলেমেয়ের জীবনকে এগিয়ে দেবার জন্যে একটু সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে ব্যাপারটাকে। দু' জনকেই তো ভালবাসে সমর। কেই বা না-বাসে? অতোবড় গুষ্ঠীতে এই দুটোর প্রতি কখনো কারো বিরূপতা দেখা যেত না।

লাটুর প্রকৃতিটা এমনই যে, কেউই ওকে ভালো না বেসে থাকতে পারে না।···সুশীলাবালা পর্যন্ত হেসে হেসে বলতো, 'এই এক মনকাড়ানি মেয়ে হয়েছে বিবোদিদির। শোউরবাড়ির খুব সুয়ো হবে। মেয়ের নিন্দে মন্দর জন্যে দুশ্চিন্তে থাকবেনি তোমার।'

আর রণুর ব্যাপারে তো একটাই কথা—ঘরে বাইরে, 'রণুর মতন ছেলে হয় না।'

সেই রণুকে নিজের দাদা ভালবাসবে, এটা কিছু বাহুল্য কথা নয়। কিন্তু প্রতীক্ষা দেখেছে রণুর প্রতি সমরের যেন একটি বিশেষ দুর্বলতা আছে।

সমরের প্রকৃতিতে বহিঃপ্রকাশ কম।

যে-কোনো ব্যাপারেই। পুরুষের দুর্বলতার প্রধান সাক্ষীই নারী। প্রধান দর্শক রাত্রি। সেখানেও সমরের প্রকৃতিকে অতিক্রম করা দুরন্ত কোনো ব্যাপার দেখতে পায় না প্রতীক্ষা।···কিন্তু রণু সম্পর্কে ওর স্নেহের দুর্বলতাটা হঠাৎ হঠাৎ ধরা পড়ে যায়। যেদিনই রণুর ফিরতে বেশী রাত হয়, সেদিনই সমরের হঠাৎ খুব গরম লেগে যায়, আর তখন 'একটু রাস্তায় ঘুরে' আসতে

ইচ্ছে করে।···যেদিনই রণু খেতে বসে বলে ওঠে, 'মাগো জননী, তোমার রান্নাঘরের মেনু যে ক্রমশই পটলডাঙার মেসের তুল্য হয়ে আসছে মা—' তার পরদিনই সমরের হঠাৎ মনে পড়ে যায়, 'অনেকদিন বাজার যাওয়া হয় নি।'

আর সময় নষ্ট করে বাজারই যদি যেতে হয় তো—সেই শহরতলির দীনহীন বাজারে কেন ? ভোরে উঠেই বাসে চেপে গড়িয়াহাট মার্কেটে পৌঁছে যাওয়া যায় এবং অফিসের টাইমের আগেই ফিরে আসা যায়।··· আহা অমন খাসা বাজার, তাদের জগুবাবুর বাজারও ছিল না। ওখানে কি আছে, কি নেই ? যা চাও, তার তো সবই আছে, যা না চাও, তাও আছে। দেখলেই মনে পড়ে যায়, চাওয়ার বাসনা জেগে ওঠে।

নীহারকণা আহ্লাদের ঝঙ্কার দেন, শখ হলো বাজারে গেলি ভালকথা। তা বলে সমস্ত বাজারটাকে ঝুলির মধ্যে পুরে তুলে আনতে হয় ?

সমর তার ছোট পুত্রের মতো বাক্যবাগীশ নয়। সে শুধু একটু হেসে বলে, বেশ ফ্রেশ জিনিস ওখানকার, অসময়ের কপি-টপি দেখে ভালো লাগল।

তা বলে এতো আনাজ তরকারি মাংস ডিম, তার সঙ্গে তিন চার রকম মাছ ! অনেয্য খরচ।

সমর অপ্রতিভের ভাব দেখিয়ে বলে, একটু বেশীই হয়ে গেছে না ? তোমাদের রাঁধতে কষ্ট।

রাঁধতে আবার কষ্ট। শোনো কথা। এই সব ভালো ভালো মাছ তরকারি দেখলে তো হাত নিসপিস করে। তবে এতো খাবে কে ? আমরা ক'জনই বা লোক ?

এতোদিন আসা হয়ে গেল, তবু নীহারকণার অনুভূতির জগৎ থেকে আগের সেই জনারণ্যের ছাপটা মুছে যাচ্ছে না। সব সময় বলেন, 'ক'টাই বা লোক !

সমর সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ও সবাই মিলে হয়ে যাবে ম্যানেজ। রণুটা তো মাছ মাংস ভালবাসে, ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিও বেশী করে।

এখন রণু রিসার্চ স্টুডেন্ট। স্কলারশিপ হিসেবে যা পায় হাতখরচের ব্যাপারে অসুবিধে নেই আর, তবে আগে তো দেখেছে প্রতীক্ষা—সমরকে নিঃশব্দে রণুর অজানিতে ওর আলনায় ঝোলানো প্যান্টের পকেটে দশ পাঁচ টাকার নোট ঢুকিয়ে রাখতে। মুড়ে মুড়ে ছোট্ট করে ভাঁজ করে। যাতে পকেট হাতড়াতে গিয়ে হাতে ঠেকলে মনে হবে, আগের পড়ে থাকা।

একবার মনে আছে রণু প্রতীক্ষার কাছেই উল্লাস জানাতে এসেছিল, উঃ বৌদি, আজ দারুণ এক অলৌকিক ঘটনা। ট্যাঁক গড়ের মাঠ বলে চুপচাপ আছি, 'মুক্তাঙ্গনে' শৌভনিকের নতুন পালার ঘোষণার দিকে তাকিয়েও দেখছি না, আর কিছু নেই জেনেও অবিরল পকেট হাতড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি পকেটের গভীর গহ্বরে এঁরা দু'জন পড়ে। ভাবো ব্যাপার।

মোচড়ানো ভাঁজ করা দু'খানা ময়লা ময়লা নোট বার করে দেখাল রণু। একটা পাঁচের একটা দশের।

এই রাখাটা হয়তো প্রতীক্ষা দেখে নি। কিন্তু কে রেখে দিয়েছে তা তো বুঝেছিল।

এমনও হয়েছে ক্রিকেটের মরশুমে সমর কতো চেষ্টায় এবং কতো ব্যয়ে কে জানে, একখানা টেস্ট ম্যাচের টিকিট নিয়ে এসে অবহেলায় রণুর সামনে ধরে দিয়ে আলগা গলায় বলেছে, এই ছাখ অফিসে একজন হঠাৎ প্রেজেন্ট করে বসলো। আমার বাবা অতো ভিড়-ভাট্টা ভালো লাগে না। তুই যাস তো যা।

প্রতীক্ষাকেও অবশ্য 'সত্য ইতিহাস'টা বলে নি সমর, তবু প্রতীক্ষার বুঝতে দেরি হয় নি। কিন্তু রণু যখন দাদার আড়ালে সন্দেহের গলায় জিজ্ঞেস করেছে, কী বৌদি, দাদা একটা গল্প বানালো না তো? প্রতীক্ষা উত্তর দিয়েছে, হ্যাঁ। তা আর নয়? লোকের এই খেলা দেখা-দেখা করে এতো মাতামাতি দেখে তো ঠাট্টা-ব্যঙ্গই করেন তোমার দাদা। ওটা নাকি লোকের পাগলামি। সেই পাগলামিতে—দূর। তবু তোমাকে দিতে মনে পড়েছে পকেটে পড়ে থেকে পচল না, এই ভালো।

সমরের এই স্নেহের দুর্বলতার খবর জানে বলেই প্রতীক্ষা ওই মৃদু আশাটি

পোষণ করছিল। এম. এ. পাস করলেও এবং মাস্টারনী হলেও প্রতীক্ষার বুদ্ধিটা যথেষ্ট কাঁচা রয়ে গেছে বই কি!

ও জানেনা স্নেহপাত্রের হৃদয়পাত্রে বিজাতীয় কোনো ছায়া পড়েছে দেখলেই, স্নেহশীল গুরুজনের চিত্ত বিরূপ হয়ে ওঠে। স্নেহটা যত গভীর হয়, বিরক্তিটা ততো প্রবল হয়।

মনস্তত্ত্বের এই এক তত্ত্ব।

প্রেমের ক্ষেত্রে এইটাই হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা।

স্নেহের ক্ষেত্রে বিরক্তি বিরূপতা, অনমনীয়তা।

১২

স্কুলে এসে ঢুকতেই কৃষ্ণা ছুটে এলো, আজ আপনার দেরি যে প্রতীক্ষাদি? রেকর্ড।

প্রতীক্ষা সামান্য একটু হেসে তাড়াতাড়ি ক্লাসে ঢুকে গেল। হাসল, হাসিতে জেল্লা নেই। মনটা একটা রাগ আর অপমানের চাপা দাহে ঝলসাচ্ছে। আরো খারাপ লাগছে স্কুলে আসতে দেরি হয়ে যাওয়ায়।

কক্ষনো এটা হয় না প্রতীক্ষার।

সকলেই দেখে দেরি করে ফেলে, আর যানবাহনের দুর্দশার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে হালকা হয়। প্রতীক্ষার একান্ত চেষ্টা ওইটি যাতে না হয়। অবশ্য যানবাহনের দশার প্রশংসা সে করে না, তবে সময় হাতে নিয়ে বেরোনো দরকার তো?

কিন্তু আজ?

ভোরবেলায় উঠে চা বানিয়ে এক গেলাস বুনোকে দিয়ে, ভুবনবিজয় আর সমরকে এক এক কাপ দিয়ে সবে নিজেরটা নিয়ে বসেছে, তখন নীহারকণা এমন একখানা অদ্ভুত কথা বলে বসলেন, যে হাত থেকে চাটা পড়তে পড়তে রয়ে গেল। নীহারকণা এদের সঙ্গে চা খান না, পুজোপাঠ সেরে বেলায় নিজে তৈরি করে নেন। আর সশব্দ স্বগতোক্তি করে করে পেয়ালায় চুমুক দেন, আমার ভাগ্য! আউশেও যা, পৌষেও তা! ছেলের বৌ হয়েছেন,

শুধু ঘরের শোভা। এখন এই একা হাতে কুটবো বাটবো, রাঁধবো বাড়বো, দেবো থোবো। চা-টুকু অবধি নিজে করে খাওয়া। ওই যে হতভাগা বুনো, তার ভাগ্যি আমার থেকে ভালো। সেও কাকে কা-কা করবার আগে চা-চা করে এসে বসে,চা-রুটি গিলে যায়। আমার কপালেই তেঁতুল গোলা।···

কথা না কয়ে থাকতে পারেন না বলেই হয়তো একটা ছুতো চান।

তা এগুলো প্রতীক্ষার অনুপস্থিতিতে—এই যা রক্ষে। কখনো কখনো ভুবনবিজয় রান্নাঘরের দরজায় এসে হেসে হেসে বলেন, আমি কিছু করে দেব ?

এবং নীহারকণার ভ্রূভঙ্গিটি উপভোগ করে বলেন, তবে নয় চায়েরই একটু ভাগ দাও। সেটাই তোমাকে সাহায্য করছি ভাবব।

চায়ে অরুচি নেই ভদ্রলোকের।

সকালে প্রতীক্ষার হাত থেকে চা নিয়ে সহাস্যে বলেন, এই যে আমার মা এলেন বিশল্যকরণী নিয়ে। মা আসার আগে এতো ভোরে কবে আর জুটতো।

ওই নির্মল হাসিটা ভারী ভালো লাগে প্রতীক্ষার।

সেই ভালো লাগা মনটা নিয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে বসেছে, সেই সময় নীহারকণা কাছে ঘেঁষে এসে চুপিচুপি প্রশ্ন করে উঠলেন, হ্যাঁগো বৌমা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—রাগ কোরো না। এই যে আজ সাত-সাতটা বছর পার হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে তোমার, তা বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না কেন ?

শুনে প্রতীক্ষা আর নেই। এ কী প্রশ্ন !

‘হচ্ছে না’ বলে আক্ষেপের স্রোত বহান যখন তখনই। কিন্তু এমন সওয়াল করতে আসেন নি তো কক্ষনো। তাও এই মহামুহূর্তে।

তবু প্রতীক্ষা শান্ত গলায় উত্তর দিলো, হচ্ছে না, হচ্ছে না ! কেন’র কি আছে ?

নীহারকণা বলেন, হলদে বাড়ির গিন্নী কাল বলছিল, এখনকার বৌ ঝিয়েরা নাকি বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলা এড়াতে, নিয়ম করে বিষ-বড়ি গেলে।

বিষবড়ি !

নীহারকণা বললেন, তা একরকম তাই বই কি। ভগবানের ছিষ্টিকে যখন ওতেই রোধ করা যাচ্ছে! তা বলি তুমিও তাই করছো না তো বাছা? হলদে বাড়ির গিন্নী তো বললো, নির্ঘাত! নচেৎ অমন স্বাস্থ্য, অমন সুন্দর চেহারা—

প্রতীক্ষার মনে হলো, চেঁচিয়ে উঠে বলে, আপনি থামবেন?—কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর বলা যায় না। তাই ঈষৎ কঠিন গলায় বললো, ছেলেমেয়ে মোটেই হলো না, এমন মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নি?

ওমা, তা দেখবো না কেন? বাঁজা মেয়েমানুষের অভাব আছে জগতে? তারা তো আবার একটা বাচ্চা বাচ্চা করে হাহাকার করছে। বিলেত আমেরিকা জাপান জার্মান—সর্বত্রই এক। পুষ্যি নিয়ে মরছে, শূন্য মন নিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

প্রতীক্ষা উঠে দাঁড়াল।

বললো, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, আর তখনি ওই দাহকারী মন্তব্যটা কানে এলো।

ঠিকই বলেছে ও বাড়ির গিন্নী। জুতোজামা পরে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে, গিন্নীদের নাকের সামনে দিয়ে মটমটিয়ে পথে বেরোনটি যে বন্ধ হবে, সেই ভয়েই এতো সব কারসাজি!

রাগে প্রতীক্ষার হাত-পা কেঁপে থরথরিয়ে উঠল।

প্রতীক্ষা বুঝে ফেললো, ও বাড়ির গিন্নাটি একটা ছুতো মাত্র। নিজেই নীহারকণা সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। আজ ও বাড়ির গিন্নীর বেনামীতে সেটা ব্যক্ত করলেন।

বাইরে বেরোবার দরজার পাশেই রণুর ঘর।

ঘরটা আজ খালি।

গতকাল লাট্টুকে পৌঁছতে গেছে রণু, ফেরে নি! কথাই হয়েছিল অত রাত্রে ফেরার চেষ্টা না করে পুরনো পাড়ায় কারো বাড়িতে থেকে যেতে। থেকে গেলে কি আর তারা চা'টা না খাইয়ে ভোরবেলা ছাড়বে? কে

জানে, কখন ফিরবে ?

প্রতীক্ষার মাথা ঝিমঝিম করছিল তাই রণুর ঘরে ঢুকে, ওর পড়ার চেয়ারটায় বসে পড়ল।

কথাটা পরিপাক করতে সময় লাগছে।

অনেক কথাই পরিপাক করে নিতে হয় মেয়েদের। তবু সব কথাই কি পারা যায় ?

ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা নয়। মিনিট দশেক বসেছিল, তাতেই স্কুলের দেরি হয়ে গেল।

নীল স্কার্ট সাদা ব্লাউজ পরা মেয়ের ঝাঁক। তাকিয়ে দেখলে এতো ভালো লাগে।

কে. জি. ক্লাসের মেয়েগুলো আরো সুন্দর।

প্রতীক্ষার কি ভালো লাগে না এই বাচ্চাদের দেখতে ?

প্রতীক্ষা কি বড়কর্তার মেয়ে বুলির মেয়েটাকে দেখে বিগলিত হতো না ? কী মিষ্টি লাগত মেয়েটাকে। নিজের ঘরে এনে খেলাতো, খাওয়াতো। বুলিরও সেটায় লাভ হতো। আর একটা তখন আসন্ন।

সমর তার ওই ছেলেমানুষী দেখে হাসতো। আর বলতো, সবুরে মেওয়া ফলে। বুঝলে ? অবস্থা একটু ফিরিয়ে না নিয়ে জড়িয়ে পড়তে নেই। বুলিটাকে দেখতে এতো খারাপ লাগে।

প্রতীক্ষার কিন্তু খারাপ লাগতো না। বুলি তো আহ্লাদে ডগমগ করতো।

বরং ইদানীং খারাপ লাগছে প্রতীক্ষার লোকের হা-হুতাশ দেখে। আহা ! এখনো বৌটি খটখটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে শিশুর হাসি নেই। বাচ্চা না হলে বাড়ি! সেদিন কে একজন কায়দা করে এক শ্লোক আওড়ালেন, যার অর্থ শিশুহীন গৃহ, যেন বিগ্রহহীন মন্দির।

প্রতীক্ষা জানে, তার নিজের মা বাবারও ষোলো আনা শখ রয়েছে প্রতীক্ষা একটা খেলার পুতুল উপহার দিক তাঁদের। প্রতীক্ষার মা পাড়ার লোকের বাচ্চাদের জন্যে গোছাগোছা পশমের জামাটুপি বোনেন।

কিন্তু নীহারকণার মধ্যে কি সেই মধুর হৃদয়াবেগের প্রকাশ ? নীহারকণা

তাঁর ছেলের বৌকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপরাধ কবুল করাতে সচেষ্ট। অথচ এ কথা নিয়ে সমরের কাছে অভিযোগ করতে যাও ? ও অনায়াসে বলবে, মার কথা বাদ দাও।

প্রতীক্ষা কি বলতে পারবে, তোমরা যত সহজে বাদ দিতে পারো, তত সহজে বাদ দেবার ক্ষমতা আমার নেই। প্রতিক্ষণ পিন ফোটার যন্ত্রণা যে কি সেটা তোমরা বুঝবে কী করে ?

মেয়েদের মধ্যেও যে আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে, সে বোধই তোমাদের মতো এই সনাতনী বাড়িতে মানুষ হওয়া ছেলেদের নেই। অথচ আত্মসম্মানে আঘাত লাগবার ভয়েই প্রতীক্ষা ওই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতে পারে না। সময় হয়তো ভেবে বসবে, এই প্রসঙ্গটাকে বড় করে তোলার অর্থ হচ্ছে—সেই আদি অকৃত্রিম মেয়েলী মনের সন্তানক্ষুধার প্রকাশ। নীহারকণা অথবা তস্য বান্ধবীর মন্তব্যটা উপলক্ষ মাত্র।

প্রতীক্ষা জানে, সমর ওই 'ক্ষুধা'টাকে নেহাত হালকা চোখে দেখে, গুরুত্ব দেয় না আদৌ। হয়তো আজীবনকাল বাড়িতে শিশুর অব্যাহত ধারা দেখে দেখে ওর চিত্ত বিতৃষ্ণ। নিজের ভাইবোন বেশী না থাকলেও ভবানী-পুরের ওই 'বিজয়'গোষ্ঠীর অন্য অন্য শাখা সে শূন্যতা পূরণ করে চলেছে। হ্যাঁ, 'বিজয়' দিয়ে নাম রাখতেই হবে ছেলেদের, তাতে নামের অর্থ থাকুক বা না থাকুক।

মেজকর্তার দুই নাতির নাম মুকুলবিজয় আর কিশলয়বিজয়।

নামের মানে কি জানতে চেও না। শুধু ঐতিহ্যের প্রতি সনম্র শ্রদ্ধার বহরটা দেখে যাও। ওদের মায়ের ওই নাম দুটি পছন্দ ? ঠিক আছে, রাখো ছেলেদের নাম 'মুকুল' আর 'কিশলয়'। কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্য 'বিজয়' শব্দটা জুড়তেই হবে।

হবে না ? বংশের ধারা বলে একটা কথা নেই ?

প্রতীক্ষা মনে মনে ভেবে রেখেছে, তার যদি কখনো এ সুযোগ আসে, সে তার ছেলেকে ওই 'বিজয়'-মুক্ত করে ছাড়বে। কিন্তু সুযোগটা কি আসবে কখনো ?

সত্যিই কিন্তু আর সন্তান-ক্ষুধায় আকুল নয় প্রতীক্ষা। মাঝে মাঝে তো

ভয়ও করে। তেমন ঘটলে তার কর্মজীবনে ছেদ পড়ে যাবে না তো? সেটা খুব ভীতিকর। মেয়েদের জীবনে যেমনই হোক চাকরি একটা, হচ্ছে পায়ের তলার মাটি। নিশ্বাস নেবার খোলা হাওয়া। পাথরের দুর্গের প্রাচীরের এক কোণে একটু একপাল্লা দরজা।

'ইস্কুলের দিদিমণি' এই শব্দটাকে যতই অবহেলায় উচ্চারণ করা হোক, আজকালকার নিয়মে—কাজটা আর্থিক দিক দিয়ে মোটেই অবজ্ঞার নয়। কিন্তু সেটাও সব নয়। আসলে ওই 'দাসত্বের বন্ধন'টারই আর এক নাম 'মুক্তি'।

প্রতীক্ষা ভাবে যদি এই কাজটা না থাকতো প্রতীক্ষার! অবশ্যই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নীহারকণার ছন্দেই আবর্তিত হতে হতো তাকে। উঃ ভাবা যায় না।···বড় দোটানার জীবন, আধুনিক মেয়েদের জীবন।

তবু রাস্তায় কোনো মা-বাবার সঙ্গে সাজাগোজা ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দেখলে, মনটা কেমন করে ওঠে। উদাস উদাস লাগে দোকানে দোকানে ঝোলানো সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট জামা দেখলে। আর বাড়িতে কোনো গরবিনী নতুন মা বেড়াতে এসে যখন যতক্ষণ থাকে, কেবল সেই নতুন রাজৈশ্বর্যের গল্প করে চলে, তখন প্রাণ হাঁপিয়ে আসে।

বিরাট গোষ্ঠীর কত দিকে কত শাখা-প্রশাখা, বারো মাসই তো নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার নেমন্তন্ন আসে, সাধ, ষষ্ঠীপুজো, মুখে ভাত, জন্মদিন, আরো কত কি! সেখানে গিয়ে হঠাৎ যেন নিজেকে কেমন নিঃস্ব নিঃস্ব লাগে।···যদিও ওইসব মায়েরা প্রতীক্ষাকে বলে, 'তুমি বেশ আছ বাবা! ঝাড়া হাত-পা—'

তবু তাদের সেই বলার মধ্যে সততা খুঁজে পায় না প্রতীক্ষা।

কিন্তু আজকের মতো এমন অপমান বোধ করে নি কোনো দিন প্রতীক্ষা। আজও ঠিক করে ফেলেছে, সোজাসুজি সমরকে বলবে, 'তোমার গুছিয়ে নেবার' জন্যে আর কতগুলো বছর দরকার?

প্রতীক্ষা জানে না সেই গুছিয়ে নেওয়াটা কি।

সমর কোনোদিন সে আলোচনা করে না প্রতীক্ষার সঙ্গে। অথচ কিছু যে একটা করে সে, সেটা বোঝা যায় ওর ওই সাঙ্কেতিক সংখ্যায় লিখিত

হিসেবের খাতাটা দেখলে।
প্রতীক্ষা কোনোদিন হ্যাংলার মতো জিগ্যেস করতে যায় না. কী ওটা? কিসের হিসেব নিয়ে এমন লুকোচুরি সমরের।
সমরকে যেন ঠিক বুঝতে পারে না প্রতীক্ষা।
তবে একটা জিনিস বুঝতে পারে, সমরের মধ্যে কোনো দোটানা নেই। কোনো এক লক্ষ্যে স্থির আছে ও।

১৩

অকস্মাৎ ভালো হয়ে যাওয়া মনটা আরো অধিক ভালো করে তুলে রণু যখন ছোট ছোট মাটির টবের মধ্যে বসানো বহুবিধ ফুলের চারা ট্যাক্‌সিতে চাপিয়ে 'লালাধামে' এসে ঢুকলো, প্রতীক্ষা তখন সবে স্কুল থেকে ফিরে স্নানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।
প্রতীক্ষার খোলা চুলগুলো পিঠে ছড়ানো, প্রতীক্ষার হাতে একটা মোটা চিরুনি।
আর প্রতীক্ষার মুখটা গম্ভীর ভারাক্রান্ত।
কিন্তু রণুর তখন ওই বৈলক্ষণ চোখে পড়বার নয়।
রণু হৈ-হৈ করে উঠল, চান হয় নি এখনো? গুড। একটু স্থগিত রাখো। চানের আগেই মাটি-ফাটি ঘেঁটে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হয়ে যাক।
ওই বিপুল বোঝা দেখে প্রতীক্ষা স্তম্ভিত।
এ কী কাণ্ড রণু?
বাঃ! কাণ্ড আবার কী? কাল তো ভুলেই মেরে দিয়েছিলাম, আজ মনে পড়ে গেল। এদিকে তোমার সেই লিস্টটা অন্য প্যান্টের পকেটে। ওই গাছওলাদেরই বললাম, যা যা ভালো-টালো আছে দাও। উঃ আনাড়ী দেখে কী খাতির আমার! পথের মধ্যেই কোথা থেকে একটা টুল এনে বসালো—
রণুর মুখে আহ্লাদের আলো।
প্রতীক্ষা কি এক ফুঁয়ে ওই আলোটা নিভিয়ে দেবে? বলবে, কেন এতো

সব এনে বাড়ি বোঝাই করলে? আমার তো আর বাগান করার শখ নেই।

তাই যদি পারতো মেয়েরা, তাহলে কি এমন বন্দীদশা ঘটতো তাদের? স্বেচ্ছাবন্দিনী নারীজাতি নিজেদেরই তো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বেঁধে মুক্তির পথ বন্ধ করে ফেলে।

সে বন্ধন মমতার।

সে বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা তার নেই।

তাই প্রতীক্ষাকেও চোখে আলো জ্বালতে হয়।

আর সেই আলো-জ্বলা চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বলতে হয়, টুলটা আবরণ মাত্র। 'পথে' যে বসিয়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

রণু হো-হো করে হেসে বলে, তোমাদের তো এই অভাগার ওপর চিরদিনই অনাস্থা। গাছ চেনায় আনাড়ী বলে কি আর দামে ঠকেছি ভেবেছ? দেখো সব টবে দামের টিকিট ঝোলানো রয়েছে।

প্রতীক্ষা নিরীহ গলায় বলে, ওঃ। ওই দামটা ঠিক করেছে বোধহয় সরকার থেকে?

সরকার থেকে!

বাঃ, সরকার থেকে না হয়তো পুলিশ থেকে। ওরা নিজেরা বসালে তো যা ইচ্ছে বসিয়ে রাখতে পারে।

ওহো-হো!

আবার হাসে।

আর থাকতে পারেন না নাহারকণা ঘর থেকে বেরিয়ে না এসে।···এতোক্ষণ বৌয়ের গম্ভীর মুখটা দেখে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল, দ্যাওর-ভাজের এই হাস্য-পরিহাসে সেটুকু মুছে গেল।

বেরিয়ে এসে বললেন, কী রে, তু'দিন পরে বাড়ি ঢুকেই এতো হাসির কী হলো?···

'তু'দিনই' বললেন। তারপরেই হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন, একি, এই গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে এলি?

বয়ে।

রণুর চটপট উত্তর, বীর হনুমানেরা ওছাড়া আর কী বীরত্ব দেখাতে পারে মাতঃ।

নীহারকণা ফুলো-ফুলো বেজার মুখখানিতে কাষ্ঠহাসির টোল খাইয়ে বলেন, তা এই পর্বতকে পুঁতবি কোথায়?

রণু টবগুলো দাওয়া থেকে নামাতে নামাতে বলে, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে মা, শুধু তুমি যদি একটু অন্তরালে যাও। নির্ভয়ে থেকো, তোমার ঘুঁটে কয়লার ঘরের জায়গা জবরদখল হবে না।

এই ছেলেটিকে কিছুতেই পেরে ওঠেন না নীহারকণা।

রেগে নয়, বকে নয়, কথা বন্ধ করে নয়।···তেমন দেখলে ছেলে অনায়াসে ভুবনবিজয়ের সামনে বলে উঠবে, বাবা। জননী এমন জলদগম্ভীর কেন? ঝগড়া করে বসো নি তো?

ভুবনবিজয়ের চোখে মুখে কৌতুক ফুটে উঠলেও গম্ভীর হয়ে বলেন, আমি? ঝগড়া? এতো সাধ্য আমার? তুমিই কী করেছ ভাবো।

আমি!

রণু আকাশ থেকে পড়ে, আমার জন্যে? আমার মতো একটা তুচ্ছ প্রাণী নীহারকণা দেবীর অটল মহিমা টলাতে পারে? অসম্ভব? মা, নিজমুখেই বলো, এতো পদমর্যাদা দাও তুমি আমায়?

অগত্যাই কথা কয়ে উঠতে হয় নীহারকণাকে। অন্ততঃ রণুর দোষ অপরাধের ঘটনা কীর্তন করতেও।

এঁটে উঠতে পারেন না বলেই মান-অপমানকে শিকেয় তুলে রেখে বলে উঠলেন, কেন? আমি সামনে থাকলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে তোর?

রণু অনায়াসে বললো, সে কি আর তোমায় বোঝাতে পারবো জননী?

বোঝালেই বুঝবো।

বুঝবে? তবে, বলি, মাগো তোমার দৃষ্টির সামনে আমার হাত-পায়ের জোর কমে আসে, হার্ট প্যালপিটেশন শুরু হয়ে যায়, মাথা বনবন করে ঘোরে আর —

থাক, আরও কিছু বলতে হবে না। ছেলের কী কথার বাহার।

বলে নীহারকণা ঘরের মধ্যে ঢুকে যান। আশ্চর্য, 'হ্যা হ্যা' করে হাসতে হাসতে।

এ ছাড়া মান বজায় রাখার উপায় কোথা পরের মেয়ের সামনে।

রণ্ বললো, বৌদি চটপট ! কাজ সহজ করতে এই দুটো অস্ত্র নিয়ে এলাম। কি যেন বলে এদের ?

প্রতীক্ষার চোখে প্রায় জল এসে যায়।

প্রতীক্ষা সেই শাবল আর খুরপিটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এই ছেলেকে অন্যমনস্ক 'উদোমাদা' বলা হয়।

ওর মা তো বলে থাকেন, 'আকাশ চোখো'।

ইহজগতের কিছুই নাকি দেখতে পায় না ও ?

১৪

বিভাবতীর এখন অনেক অবসর। তাই বিভাবতীকে বেশির ভাগ সময়েই এই জন্যে দেখা যায়, হাতে দুটো কাঠি, কোলের উপরে একটা পশমের গোলা, আর দৃষ্টি দূর-নিবদ্ধ।

চৌধুরী গোষ্ঠীর কাজের জাঁতায় পেষাই হয়ে থাকা বিভা কখনো নিজেকে নিয়ে ভাববার সময় পেত না। বিভা ক্রমশ বুঝি ভাবতেই ভুলে গিয়েছিল।...বিভার যে নিজের (স্বল্প দিনের হলেও) একটা সংসার ছিল, ছিল হৃদয়বান স্বামী, ছিল উজ্জ্বল রঙে আঁকা ভবিষ্যতের ছবি সে সব কোনো দিন আর দেখতে বসতো না বিভা তার জীবন গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের পাতা উল্টে উল্টে।

এতোদিন পরে বিভা সেই পাতাগুলো খুলে খুলে দেখে ধুলো ঝেড়ে ঝেড়ে। এখন কেবল কেবলই মনে পড়ে যায় সেই মানুষটাকে। যার নাম ছিল শান্তিকুমার। কান্তির চেহারার আশ্চর্য আদল আসে তার। চলা-ফেরা গলার স্বর সব কিছুর মধ্যেই।

সেটাই হয়তো এই এতো মনে পড়ে যাওয়ার কারণ।

দশ বছর বয়েস থেকে অন্যত্র মানুষ হয়েছে কান্তি। প্রথমে স্কুল বোর্ডিংয়ে,

কলেজ হোস্টেলে, অতঃপর তো ভারত ছাড়া হয়ে।···পরবর্তী কালেও কান্তির জীবনচর্চার পদ্ধতি, তার দাদা শান্তির থেকে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তবু কী করে এমন সাদৃশ্য এসে যায়? সেটা কি কান্তিকুমার মনেপ্রাণে বদলে যায় নি বলে? নিজের সেই শৈশব বালাটুকুকে এখনো মনের মধ্যে সযত্নে লালন করছে বলে?

করছে, করে রেখেছে এ যাবত। তা বোঝা যায়।

হয়তো সেইটুকুই ছিল ওর সত্যিকার 'নিজস্ব জীবন'।

তাই বিভার সঙ্গে কথা বলতে বসলেই পুরনো কথা পেড়ে বসে। যেটা নাকি ওর বৌ স্বাগতার দু চক্ষের বিষ। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।··· যে ছবিতে 'আমি' নেই, সেই ছবিতে আমার কী আকর্ষণ? 'আমি'বিহীন পারিবারিক গ্রুপ ফটোর দিকে কে তাকাতে যায়? স্বাগতা তাই ওই 'স্বাগতাবিহীন' ছবির অ্যালবাম খুলতে দেখলেই রেগে যায়।

অথচ সময় পেলেই মিঃ কে. কে. রায় খুলে ধরবেন তাঁর তামাদি হয়ে যাওয়া জীবনের অ্যালবাম। তোমার মনে আছে বৌদি, দাদাকে আমি কী রকম ভয় ভয় করতাম।···ভীষণ অবাক্ লাগতো আমার তুমি যখন সেই লোকটার সঙ্গে দিব্যি হাসিগল্প করতে, এমন কি বকেটকেও দিতে।

বিভা বলে, মনে সবই আছে। আমি তোমায় সাহস দিতাম, এতো ভয় করিস কেন? ও কি তোকে বকে মারে?

কান্তি বলে, তা সত্যি। এখন তাই ভাবি দাদা তো কোনো দিন শাসন-টাশন করতো না। মারা তো ছেড়েই দাও বকতোও না তো। তবু ভয় করতাম কেন?

লাট্টুও মাঝে মাঝে থাকে এ আসরে। বলে ওঠে, শাসন করতেন না বলেই বোধহয়। বকা-মারা শাসন-টাশন এসব হচ্ছে হাল্‌কা জিনিস। এতে শাসক ব্যক্তির নার্ভাসনেসটাই ধরা পড়ে যায়। ওই না-শাসনটাই বড় ভয়ঙ্কর। হিমালয় তুল্য।

এই মেয়েটা কিন্তু খুব ঠিকঠিক কথা বলে। না বৌদি? যা বললো, বোধহয় তাই ঠিক।

বিভা হাসে, কথার চাষের বাড়িতেই মানুষ তো!

কান্তি আবার অতীতে চলে যায়।···

যে ঘরটায় আমি থাকতাম তার দেওয়ালের গায়ে একটা দরজা-বন্ধ আলমারি ছিল মনে আছে ?

খুব। তাতেই তো তোমার সর্বস্ব থাকতো।

সেই তো, নিতাইটা পাছে নিয়ে নেয় বলে তালাবন্ধ করে রাখতাম।···নীতিন জ্যাঠার সঙ্গে চলে যাবার সময় তার কিছুই নেওয়া হলো না। উঃ কী মন কেমনই করতো ! কত কত দিন পর্যন্ত মনে হতো, সেই বাড়িটায় একবার যেতে পেলেই হয়তো দেখতে পাবো সেই মরচেধরা ছোট্ট তালাটা সেখানেই ঝুলছে। আর খুলে ফেললেই দেখতে পাবো আমার সেই কলের লাট্টুটা, চার চারখানা আস্ত ঘুড়ি। লাল মাঞ্জা দেওয়া সুতো ভর্তি লাটাইটা, গোলমতো কাঁচের পেপার ওয়েটটা আর গল্পের বইগুলো।···'যত সব ভুতুড়ে গল্প' নামের একটা আমার বই ছিল, তার সব গল্পগুলো পড়াও হয় নি। দাদার অসুখ করে গেল।···পরে, বড় হয়েও, দোকানে দোকানে খুঁজেছি সে বই, কোথাও পাই নি। কার লেখা, কে পাবলিশার, কিছুই তো মনে নেই। আর তখন কি ওসব দেখতামই না কি ? গল্প না গল্প !

এমন কত কথাই হয়। এইটাই সব থেকে প্রিয় প্রসঙ্গ কান্তির।

শুনলে মনে হয় সেই একটা মাঝারি একতলা বাড়ির ছোট পরিবেশের মধ্যে যেন এখনো কান্তিকুমার নামের কতকগুলো ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চার বছরের, পাঁচ বছরের, ছ বছরের, সাত আট নয় দশের তাদের সেই জীবনের পরিবারে লোকসংখ্যা খুব কম। নিঃসঙ্গতাই তার সঙ্গী। সেই সঙ্গীর একটা আশ্চর্য মোহময় আকর্ষণ ছিল তার কাছে। একা নির্জন দুপুরে যেন একটা অলৌকিক মাদকতা।

মাকে মনে পড়ে না, বাবাকে অল্প অল্প। রোগা খিটখিটে একটা মানুষ। কান্তি নামের সেই পাঁচ বছরের ছেলেটাকে তিনি কেবলই কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইতেন। বলতেন, যাঃ যাঃ ! বৌদির কাছে যা।

হ্যাঁ, তখনই বৌদি।

নারীবিহীন সংসার, শুধু দিন আসার অপেক্ষায় দিন গুনছিল। কবে আসবে সেই দিন। আসবে কোনো একটা মেয়েকে নিয়ে এসে গৃহিণীর শূন্যপদে

বসিয়ে দেওয়ার ন্যায্যমত লগ্ন।

সতেরো বছর বয়েসে বিভা সেই উচ্চপদে এসে বসেছিল। গৃহিনীর এবং জননীরও। সুন্দরী বিভার পক্ষে হয়তো বিয়েটা তেমন জুতের হয় নি, কিন্তু মা বাপমরা মেয়ের আর কতই বা হবে?

বিভার যাই হোক, ছেলেটা বর্তে গিয়েছিল। জন্মাবধি তার যা কিছু চাহিদা, দাদাই মিটিয়েছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে বয়েসের অনেক তফাত। মাঝখানে না কি স্বল্পজীবী স্বল্পজীবী দু' চারটে শিশুর আবির্ভাব ঘটেছিল, অতঃপর এইটিকে উপহার দিয়ে নিজেই বিদায় নিয়েছিলেন মহিলা।

বাবা রুগ্ন তিক্ত এবং এই অপয়া ছেলেটার প্রতি ক্রুদ্ধ। অতএব যা কিছু দাদা। কিন্তু দাদাও তো ক্রমশ কাজের চাকায় বাঁধা হয়ে যাচ্ছিল। দাদা অফিস যেতে শুরু করল। অতঃপরই ছেলেটা একটা ভালো মতো আশ্রয় পেল। যে আশ্রয় তার নাম বৌদি।

সব সময় বৌদি বৌদি বৌদি।

জামা পরিয়ে দিতে, চুল আঁচড়ে দিতে, দুধ খাবার সময় আবোল-তাবোল কথা বলে ভোলাতে। আর পরে- গুছিয়ে স্কুলে পাঠাতে, পড়া বলে দিতে। সর্বোপরি গল্প বলতে।

লাটুকে কাকা হেসে হেসে বলেছে, তুই যখন জন্মালি, তোর ওপর দারুণ হিংসে হয়েছিল আমার। বৌদি হাতছাড়া হয়ে গেল।

কখনো বলতো, আচ্ছা বৌদি, নিতাইটাকে আর কখনো দেখেছ?

না ভাই।

ওর ওপর তখন আমার ভারী রাগ ছিল। আমার থেকে কী বা এমন বড়, অথচ কী সর্দারিই ফলাতো আমার ওপর। স্কুলে পৌঁছাতে যেতো যেন গার্জেন। মনে হতো নিতাই দেশে চলে গেলে বাঁচি। পরে অথচ নিতাইটার জন্যে এতো মন কেমন করতো। রাস্তায় গেঞ্জি হাফ প্যান্ট পরা কোনো ছেলে দেখলেই মনে হতো নিতাই নয় তো? তখনো যে তার ওই বয়েসটা থাকার কথা নয়, খেয়াল হতো না। পরে হাসি পেত।

আচ্ছা! কান্তিকুমার নামের লোকটা, যে নাকি জীবনে রীতিমত সাফল্যের

মুখ দেখেছে, সে কেন তার সেই দীনহীন শৈশব বাল্যটাকে এমন সোনার কৌটোয় তুলে রেখেছে ? আশ্চর্য বই কি !

কিন্তু তোলা ছিল বড় গভীরে গোপনে।

এখন হঠাৎ হঠাৎ যখন কৌটোটা খুলে পড়ে, মনে হয় ওই জীবনটাই বুঝি ছিল তার সত্যকার নিজস্ব জীবন। পরবর্তী কালটা পোশাকী জামার মতো।

ওর সেই স্বচ্ছন্দ আটপৌরে জীবনটার একমাত্র দর্শক ছিল বিভা। তাই বিভার কাছে এসে বসলেই যেন সেই গভীর নিভৃত থেকে কৌটোটা উঠে আসে জলের ঢেউয়ে উঠে আসা তলিয়ে থাকা জিনিসের মতো।

লাট্টু সেদিন রণুকে বলেছিল, কুকুরটাকে 'কুকুর' বলে অবহেলার চোখে দেখো না রণুদা। আমরা আসার আগে ওইটা ছাড়া কাকার আপন বলতে আর কিছু ছিল না।

সব কোম্পানির। এই যা সব দেখছো, বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার, ফুলদানী, কার্পেট, ক্যাকটাস, মানি প্ল্যান্ট সমস্ত কিছু কোম্পানির। এমন কি বৌটি পর্যন্ত কোম্পানির মালিকের মেয়ের। ওই কুকুরটাকেই কাকা নিজে কোথা থেকে এনে পুষেছে।

তোরা এসে তবে কাকা 'আপন লোক' পেল ?

রণু বলেছে ব্যঙ্গ করে।

লাট্টু হেসেছে, তা নাহলে কি এই বড়লোকের বাড়িতে টিঁকতে পারতাম রণুদা ?

কান্তিকুমারের ওই স্মৃতি রোমন্থনের আসবে কদাচই স্বাগতার উপস্থিতি ঘটে। ছুটির দিনের লাঞ্চ টাইমটা সেই মহাসৌভাগ্যময় সময়। তখন স্বাগতাকে সাদা চোখে দেখা যায়। তখন স্বাগতা সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরে বেড়ায়। সাদা বাংলায় কথা বলে।

তখনই বলে, খুব তো কবিত্ব করে করে বলা হচ্ছে, এতোদিন এতো সব ছিল কোথায় ? 'বৌদি' নামটাও তো শুনি নি কোনোদিন। তোমার যে একটা ছোটবেলা ছিল, কেউ জেনেছে কখনো ?

কান্তিকুমার বলে, কাকে জানাতে যাব ?

তা তো বটেই। 'মানুষ' বলে গণ্য করা যায়, এমন কে আছে বাড়িতে? বুঝলেন বিভাদি, এই সমস্ত স্মৃতির গল্পটল্প সব আপনাকে শোনানো। ফর শো। কেন, এতোদিন নিয়ে আসতে পারো নি বৌদিকে? আপনি নিজে থেকে বললেন বলেই না—

কান্তিকুমার বলে, তোমার মন্তব্য কারেক্ট। বৌদি নিজে থেকে না বললে কোনোদিনই হয়তো হতো না। ব্যাপারটা হয়েছিল—অদ্ভুত একটা ভয়। যাকে বলা যায় আতঙ্ক।

স্বাগতা কড়া গলায় বলে, ওঃ! ভয়টা নিশ্চয় আমাকেই? যদি তোমার আপনজনকে বাড়িতে ঢুকতে না দিই?

তা নয়।

কান্তি মৃদু হাসে। ভয় বৌদিকেই। যদি বদলে গিয়ে থাকে। যদি চিনতে না চায়। যদি আসতে বললে না আসে। আমার জীবনে একখানা জলজ্যান্ত বৌদি ছিল। তার মৃত্যু ঘটলে সইতে পারব না বলেই—

খুব হয়েছে।

স্বাগতা তীব্র হয়। সব বানানো কথা। এই লোকটার কথা আপনি একদম বিশ্বাস করবেন না বিভাদি। একের নম্বরের শয়তান।

বিভাকে বিভাদি না বলে শুধু 'দিদি' বলতে বলেছিল কান্তি, স্বাগতা নিজের জেদ ছাড়ে নি। বলেছে, আমার যা খুশী বলবো। ডেকে ডেকে অনর্গল গালাগালের স্রোত বহায়।

শয়তান, ছোটলোক, মিথ্যেবাদীর রাজা, বিশ্বাসঘাতক ওকে ডির্ভোস করাই উচিত ছিল আমার। করি নি ওর ভাগ্য। আপনাদের সামনে কতই ভালমানুষী। এতোদিন আপনাদের নিয়ে আসে নি কেন জানেন? যদি আমি একটু আরাম পাই। ভেবে দেখুন বাড়িতে ওই একটামাত্র লোক। তার সর্বক্ষণ কাজ আর কাজ। আমার সঙ্গে একটা কথা বলার সময় নেই। কোম্পানির হিসেব দেখছেন। আমার বাবার কোম্পানি। তার ভালোমন্দ নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কেন হে? ধ্বংস হয়ে যাক না। শ্বশুরের আণ্ডারে পড়ে থাকবার দরকারটা কী? আর চাকরি জুটতো না?

এ সময় হয়তো কান্তিকুমার বলে, ভুলে যাচ্ছ। আগে উনি আমার পিতৃ-

বন্ধু, পরে শ্বশুর। ওঁর ছেলে নেই, আমায় উনি ছেলের মতো ভেবে তৈরী করে তুলেছেন যাতে ওঁর কোম্পানিটা রক্ষা হয়।

আর তুমি মুখ্যু গাড়োল, সেই ফাঁদে পা দিয়েছ। হুঁ! আবার দরদ কত? উনি কর্মব্যস্ত। আমি লোনলি ফিল করি বলে আমায় ক্লাবে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো। তারপর জানেন, নিজে কেটে পড়ল। ভাবতে পারেন? আমায় ওই জোচ্চোর ফেরেববাজগুলোর দলে ভিড়িয়ে দিয়ে, নিজে পালিয়ে এসে কাজ নিয়ে মত্ত থাকেন। ওই পাজা শয়তান ফিচেল জোচ্চোরগুলো আমায় খেলায় হারিয়ে দেয়। দিয়ে মজা পায়, আর বলে, মিসেস রায়, আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। একটু ড্রিঙ্কের দরকার। ও সঙ্গে থাকলে ওরা আমায় হারাতে পারে? গেলাস এগিয়ে দিতে পারে?

কান্তিকুমার বলে, এটা খুব ঠিক বলছ না স্বাগতা। তোমার হেরে গিয়ে রেগে যাওয়া, উত্তেজিত হয়ে যা ইচ্ছে গাল দেওয়ার বাড়াবাড়ি দেখেই আমি তোমায় নিয়ে ক্লাব থেকে সরে আসতে চেয়েছিলাম। তোমাকে বাঁধন কেটে আনতে পারা গেল না। আলোর পোকার মতো অবস্থা তখন তোমার। মরবে জেনেও ছুটবে।

ওঃ! তাই তো! তাই নিজে কেটে পড়লে। আর আমার নিজের বাবা, আমায় ডেকে বলে কিনা আমার জন্যে তার নিজের মাথা হেঁট, তার জামাইয়ের মাথা হেঁট। আমি লোনলি ফিল করি বলে চাকরি জুটিয়ে দেওয়া হলো। কেন? আমার চাকরি করার কী দরকার? আমি চেয়েছিলাম চাকরি করতে? আমি আমার মায়ের মতো শুধু সংসার করতে পারতাম না? কেন? নিজের বাচ্চাকে নিজে দেখতে পারতাম না? বেশ করব, আমি জুয়া খেলব, ড্রিঙ্ক করব। মাঝরাতে বাড়ি ফিরবো।

বলে, আর টেবিলে খাবার সাজায়।

ছুটির দুপুরে সে রাঁধবেই কিছু। আর পরিবেশনও করবে।

অথচ কান্তি না থাকলে? অন্য মানুষ। লাট্টুর সঙ্গে কত কি গল্প করে। ওরা আমায় বাদশা বেঁচে গেছে, এমন কথাও বলে ফেলেছে কখনো।

বিভা আড়ালে বলে, দোষ তোমারও আছে কানু। তুমি ওকে বুঝতে চেষ্টা কর নি। ওর বাবা তোমায় বাইরে পড়তে পাঠিয়ে, মেয়েকে তোমার

মনের মতো করে তুলতে, একটি কিম্ভুত জীব করে গড়ে রেখেছিলেন। ও হয়তো ঘরোয়া জীবনই চেয়েছিল। তোমরা সেটা বুঝতে চেষ্টা কর নি। সব মেয়েই কি বাইরের জীবন চায়?

কান্তি বলে, হয়তো তাই।

তাই। এখন যেই দেখছে তোমার মধ্যেও নেহাত ঘরোয়া একটা জীব লুকনো ছিল, ক্ষেপে যাচ্ছে।

বাঃ তাহলে তো তোমায় দেখলেও চটে যেতো। কিন্তু তোমায় তো ভেতরে ভেতরে বেশ ভালবেসে ফেলেছে।

বিভা হাসল। তা জানি। এসব বোঝা খুব শক্ত কানু। যাকে একবার ভুল ছাঁচে ঢেলে গড়ে ফেলা হয়ে যায়, তাকে আর একটা গড়ন দেওয়া শক্ত। ওকে যে রোজদিন ছেলের জন্য ওই উন্নাসিক বাবার বাড়ির শরণাপন্ন হতে হতো, এতে খুব বিরক্তি ছিল ওর। সেটা থেকে রেহাই পেয়েছে, মনটা ভালো হয়ে গেছে।

কানুও হাসল, ভালো হবার প্রমাণ তো দেখি না। সেই তো সন্ধে হলেই অস্থির হয়ে ছুটবে।

বিভা হেসে বললে, তবে আর নেশা কথাটার মানে কী? কিন্তু আমি বলছি, মেয়েটা ভালো।

আমিও বলছি। নেশাটা ছাড়িয়ে দিতে পারো, এমন ক্ষমতা রাখো না?

কান্তির গলার স্বর নিচু।

বিভা বললো, জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। ভবানীপুরের বাড়িতে থাকতে কোনোদিন কি ভাবতে পারতাম, এই সাহেব বাড়িতে ঠেলে উঠে দিব্যি বসবাস করব?

১৫

ফুল গাছের শখ হয়েছিল, সেটা রণুকে বলার কী ছিল? ক্ষুব্ধ প্রশ্ন করে সমর, আমায় বললে এনে দিতাম না?

সমরের কথায় চমকে উঠল প্রতীক্ষা।

বললো, কেন ? রণুকে বলায় দোষ হয়েছে ?

দোষ গুণের কথা নয়, যেটা স্বাভাবিক সেটা করাই সঙ্গত।

জানলার পর্দাটা উড়ছিল। লালবাড়ির জানলায় একটা ছায়া। ছায়াটা আজকাল ক্রমশই স্থায়ী হয়ে উঠছে।

প্রতীক্ষা আস্তে উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, রণুকে যদি আমি কোনো কাজ করতে দিই, সেটা অস্বাভাবিক ?

তর্ক করার ইচ্ছে আমার নেই। দেখলাম, মা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

প্রতীক্ষার কণ্ঠ ভেদ করে হঠাৎ যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর বেরিয়ে আসে,— তার মানে ?

এতে মানে খোঁজার কী আছে ? মাকে একবার না জানিয়ে—

কে বললে, মাকে জানাই নি ?

জানিয়েছিলে ? কই, মা তো তা—

মার কথা থাক। তোমার নিজের কথা বল। রণুকে কোনো কাজ করতে বলা আমার অন্যায় ?

প্রতীক্ষার এই জেদী রূপটা সমরের অচেনা লাগছে। সমর বিপন্ন বোধ করে। তবু গম্ভীর গলায় কেটে কেটে বলে, কাজের কাজ হলে অবশ্যই অন্যায় নয়। কিন্তু এসব শখ-টখের ব্যাপারে আমায় না বলে ওকে ব্যস্ত করতে যাওয়ার দরকার কি ? এতে আমায় ছোট করা হলো না কি ?

প্রতীক্ষা জানলার ধাপে বসে পড়ল।

এতে তোমায় ছোট করা হলো ?

ভেবে দেখো। স্বভাবতই মনে হতে পারে আমায় বললে হয়ে উঠবে না বলেই, অপরকে ধরতে গেছ।

অপরকে ?

প্রতীক্ষা স্থির গলায় বলে, তাহলে এটাই ধরে নিতে হবে, রণু শুধু তোমারই ভাই, আমার কেউ নয় ? আচ্ছা সবক্ষেত্রেই সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করব।

সমর প্রমাদ গোণে !

ওর মনের মধ্যে অনেক পরিকল্পনা। ভেবেছিল, এখনই প্রতীক্ষার কাছে

বলে ফেলবে না, কারণ মেয়েদের স্বভাব আলগা। হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে গেলে মুশকিল। অফিসের কাজ বাদেও একটি অর্থকরী ব্যাপারে লেগে আছে সে বেশ কিছুদিন। না, রেস জুয়া ফাটকাবাজিটাজি নয়। অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে জমি কেনা-বেচার কাজ করে টাকা কিছু জমিয়ে ফেলেছে সে। ভারী লাভজনক ব্যবসা। দু' পক্ষের কাছ থেকেই কমিশন আদায় করা যায়। আবার নিজে কিছু কিনে ফেলেও চড়া দামে বেচে দেওয়া যায়।

জমির দাম তো এবেলা ওবেলা বাড়ছে। বেড়েই চলেছে।

এই সূত্রেই সমর নিজের জন্যে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করে ফেলেছে। সুন্দর চৌকো জমি, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভবিষ্যৎ আছে। সেও শহরতলি, তবে এদিকটার মতো 'মোটা' রুচির পাড়া নয়। যারা সব বাড়ি করেছে আশে-পাশে, সকলেই বেশ সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত। ছবির মতো বাড়ি, সামনে কিছুটা বাগান, শৌখীন গ্রীলের গেট।

ওই রকম একখানি বাড়ি বানাবার ইচ্ছে পোষণ করছে সমর। একান্ত নিজস্ব। বাবার এই ছোট্ট বাড়ি কি ভবিষ্যতে দুই ভাইয়ের পরিবারকে জায়গা দিতে পারবে? সমর ভেবে রেখেছে আগে থেকেই বলে দেবে যে, সে তার বাবার বাড়ির ভাগ চায় না। রণুটা আলাভোলা, কোনোদিনই টাকাপত্তর জমাতে পারবে না। নিজের জন্যে কিছু করে উঠতেও পারবে না। পুরো বাড়িটা যেন রণুর নামেই উইল করে রাখেন ভুবনবিজয়।

এই পরিকল্পনার পিছনে অনেক খেটে চলেছে সমর, গোপনে নীরবে। অনেকটা এগোক, তবে বলা যাবে।

আজ হঠাৎ কী হলো, বলে বসল। হয়তো প্রতীক্ষার বিদ্রোহী মূর্তি দেখে ভাবনা হলো।

বললো, তিলকে তাল করছ তুমি। কি বললাম, আর কী ভেবে বসলে। এ বাড়ির পিছনে ওইটুকুতে কীই বা বাগান হবে তোমার। বাবা তো ভেবে বসে আছেন, ওখানে গোয়াল বানাবেন।

কী বানাবেন?

চমকে ওঠে প্রতীক্ষা।

ওই আট ফুট বাই বত্রিশ ফুট জমিটার অর্ধাংশটাতে তো ঘুঁটে কয়লার ঘর হবার কথা। তার মানে কি গোয়াল ?

গোয়াল মানে ?

সমর মৃদু হেসে বলে, গোয়াল মানে গোয়াল। গরুর আস্তানা। সংসারের সকলের মনের মধ্যেই কিছু না কিছু গোপন বাসনা থাকে, বুঝলে? বাবার সেই বাসনাটি হচ্ছে—গরু পুষে খাঁটি দুধ খাবার।

প্রতীক্ষা তার শ্বশুরের মুখের চেহারাটা একবার ভেবে নেয়। অসম্ভব নয়। দুধের খাঁটিত্ব নিয়ে প্রায়ই কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। তাঁদের ছেলেবেলায় ভবানীপুরের ওই বাড়িরই নিতান্ত নিকটে ছিল খাটাল। গোয়ালারা বাড়িতে গরু নিয়ে এসে সামনে দুধ দুয়ে দিতো। সে দুধের কী টেস্ট! এখন দুধ বলে যা খাওয়া হয়, তা শুধু মনকে চোখ ঠারা ইত্যাদি।

কিন্তু ভুবনবিজয় তাঁর গোপন ইচ্ছেটি শুধু ছেলের কাছেই ব্যক্ত করেছেন? কই, প্রতাক্ষাকে তো বলেন নি। কত গল্পই তো করেন প্রতীক্ষার সঙ্গে। ওঃ, তাই নীহারকণা বলেছিলেন, 'তোমার শ্বশুর ওখানে কী যেন করতে চান।' তার মানে তিনিও জানেন।

প্রতীক্ষা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সেই অন্যমনস্ক গলাতেই বলে, বাবা আমায় বলেন নি।

আরে বাবা, বাবা আমাকেই কি ডেকে ডেকে বলেছেন? বললাম তো, গোপন বাসনা। তবু জানা হয়ে যায়। এই যেমন আমার বাসনার কথাটা তোমার জানা হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, চুপিসাড়ে একেবারে বাগানদার বাড়ি বানিয়ে ফেলে তোমায় নিয়ে গিয়ে বসাবো। তাই ওই তুচ্ছ বাগানের কথায়—

বাগানদার বাড়ি বানিয়ে!

প্রতীক্ষার মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। তা হলে তো আগামী জন্মেও আমাকে তোমার বৌ হতে হয়।

সমর একটু তাকাল। কথাটার মানে বুঝতে একটু দেরি হলো ওর। তারপর গভীর গম্ভীর গলায় বললো, অতোটা অপেক্ষা করবার দরকার হবে না বোধ হয়। এ জন্মেই করে উঠতে পারবো আশা করছি। জমি কিনে রাখা

আছে—প্ল্যান করছি—

প্রতীক্ষা আর একবার তেমনি চমকে উঠল। জমি কিনে রাখা আছে!

আছে। সল্ট লেকের ওদিকে। বাড়ি করেও সামনে খানিকটা জমি থাকবে ফুলগাছের জন্যে—

প্রতীক্ষা আস্তে বলে, নিজে আলাদা জমি কিনেছ?

না কিনলে? সদ্‌ব্রাহ্মণ বলে কি কেউ দান করবে? না কি নতুন কোনো শ্বশুর যৌতুক দেবে?

সমর পরিস্থিতি হালকা করতে চাইছে।

কিন্তু প্রতীক্ষা চাইছে না। প্রতীক্ষার গম্ভীর অভিযোগের গলায় বললো, নিজে আলাদা জমি কিনেছ। বাবাকে জানাও নি, এটা শুনতে পেলে বাবা কী ভাববেন?

আর বাবা, আগে থেকে শোনালে অসুবিধে নেই? এক্ষুনি তো হয়ে যাচ্ছে না। হয় তো এক বছর দেড় বছর লেগে যাবে। ততদিন তাহলে এখানে থাকাটা হবে স্রেফ চোরের মতো। প্রায় হাজতের আসামী। চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো। জমি কিনেছি, একলার জন্যে বাড়ি বানাচ্ছি, অথচ এখানে খাচ্ছি দাচ্ছি—সেটা কেমন দেখতে লাগবে?

প্রতীক্ষা বললো, চক্ষুলজ্জা আছে সেটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমারই অবাক লাগছে। এই বাড়ি থেকে শুধু আমায় নিয়ে চলে গিয়ে সংসার পাতবে, এমন কথা ভাবছো তুমি। অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

ভাবতেই হয়েছে। ভবানীপুরের বাড়ির পরিণাম তো দেখলে?

সেটা তিন পুরুষের জের।

সমর হাসল। বললো. দেখতে দেখতেই তিন পুরুষ। বাবা থাকতে আমাদের ছেলেটেলে হলেই নেমে গেল তিন ধাপ।

প্রতীক্ষা কঠিন গলায় বললো, সে তো আর হচ্ছে না।

সমর ম্লান গলায় বললো, এভাবে আমায় বিচার কোরো না প্রতীক্ষা। বড়লোক তো নই যে, সব হয়ে সব কিছু হবে। কিছু সাধ ইচ্ছে তো ছাঁটতেই হবে। তা ছাড়া বাচ্চাকাচ্চায় জড়িয়ে পড়লে প্রবলেমও বেড়ে যাবে অনেক, এ তো ঠিক? নতুন বাড়িতে স্থির হয়ে বসার পর তখন

তাদের ডাক দিলেই হবে।

প্রতীক্ষা একটু তিক্ত বিষণ্ণ হাসি হাসল।

বললো, 'সময় সুবিধে নেই' বলে যাদের ঠেলে বিদায় দেওয়া হচ্ছে, 'সুবিধে হয়েছে এবার আয়' বলে ডাক দিলেই তারা আসবে, এ গ্যারান্টি আছে?

সমর বিপন্ন গলায় বলে, গ্যারান্টি আর কিসে থাকে বলো? এখন ভাবছ আসতে দিচ্ছি না। কিন্তু দিতে চাইলেই যে আসতো এমন নিশ্চয়তা আছে?

তোমার আমার মা বাপ হবার যোগ্যতা আছে কিনা তারই কি কোনো প্রমাণ আছে?

এর আর কী উত্তর দেবে প্রতীক্ষা?

প্রতীক্ষার আত্মসম্মানে ঘা লাগছে।

তবু প্রতীক্ষা বললো, যাচাই না হলে আর প্রমাণ হবে কী করে?

যাচাইটা না হয় দু' দশদিন পরেই হবে। সমর বললো, ব্যাপারটা খুব তো আশ্চর্যও নয়, নতুনও নয়। পৃথিবী জুড়েই তো চলছে ব্যবস্থা।

চলছে। তবু—

প্রতীক্ষার গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে, তবু শুনতে হয়, 'হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ফরসা পোশাক পরে রাস্তায় ঘোরার স্বাধীনতা বন্ধ হবে বলেই আমি— বিষবড়ি খেয়ে খেয়ে—'

সমর আস্তে বলে, জানি প্রতীক্ষা। ভেবো না আমি কিছু বুঝি না। দেখি না। সেইজন্যেই তো চাই একটু শান্তি স্বস্তি নিশ্চিন্ততা। এখন তো এই। আবার আর এক বৌ-টৌ এলে কী পরিস্থিতি হয় কে জানে? তার আগেই আমি সরে যেতে চাই। আর এইটুকু বাড়িতে তো চিরকাল কুলোবেও না। এ বাড়ির সবটাই রণুর থাকবে। ও যা ছেলে, কিছুই তো করে উঠতে পারবে না। হয়তো যা-তা একটা বিয়ে করে বসে ভেস্তে যাবে। তবু মাথা গোঁজার ঠাঁইটা থাকবে ওর।

রণুর যা তা বিয়ে সম্বন্ধে তাহলে ভয় জন্মে গেছে বড়ভাইয়ের।

লক্ষ্যস্থল লাট্টু নয় তো?

তবু, একটু আগে সমর রণুকে 'অন্য লোক' বলার জন্যে প্রতীক্ষার মধ্যে

যে বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল, সেটা আস্তে ঠাণ্ডা মেরে গেল।

রণুর জন্যে তাহলে এখনো একটি স্নেহময় হৃদয় তার বড়ভাইয়ের মধ্যে? কিন্তু—

প্রতীক্ষা ভাবতে পারছে না। রণুর সামনে দিয়ে, ভুবনবিজয়ের সামনে দিয়ে, নীহারকণার সামনে দিয়েও এবং অলক্ষিতে চিরপরিচিত চক্ষুগুলির সামনে দিয়ে সে একা সমরের সঙ্গে 'বাগানদার' নতুন বাড়িতে থাকতে যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে বললো, এতো সব টাকা তুমি কোথায় পাচ্ছো?

প্রতীক্ষার গলার স্বরের সন্দেহ চাপা রইল না।

সমরের গলার স্বর ক্ষুব্ধ হলো, ভয় নেই। ঘুষটুস খাচ্ছি না। অফিসের ক্যাশও ভাঙছি না। রেস খেলা ফাটকা খেলা—এসব কিছুই না। এক বন্ধুর সঙ্গে একটা ছোটখাটো ব্যবসা করছি, তা থেকেই আসছে কিছু

হঠাৎ সমর উদাস বিষণ্ণ হয়ে যায়। বলে, তোমার জন্যেই সব। তুমি যদি না চাও, বেচে দেবো জমি।

কিন্তু সত্যিই কি প্রতীক্ষার জন্যে? সমরের নিজের মনের মধ্যেই কি এই বাসনার অঙ্কুর জন্ম নেয় নি কতদিন আগে?

শুধুমাত্র 'বাড়ির একজন সদস্য' এই তুচ্ছ পরিচয়ের মধ্যে চিরকাল আবদ্ধ থাকতে ইচ্ছে হয় না সমরের। সে পরিচয়ের মধ্যে অবশ্য নিশ্চিন্ততা আছে, নির্দায় শান্তিও থাকতে পারে, কিন্তু গৌরব কোথায়?

পরবর্তী কালেও কি গৃহকর্তার পোস্টটা দেবে তাকে কেউ? ভুবনবিজয়ের পরে? নাঃ! বাড়ির দুই ছেলের মধ্যে বড়ছেলে, শুধু এইটুকু তক্‌মা। সে তক্‌মার সম্মানই যে জুটবে, তাও বলা যায় না। দিনকাল কত পালটাচ্ছে দেখছেই তো চোখের সামনে। সমররা ছেলেবেলায় জ্যাঠামশাই মেজ-জ্যাঠামশাই বলে যে রকম সন্ত্রস্ত থাকতো, ছোটকাকা, ন'কাকার ছেলেরা কি তেমন থেকেছে?

ছেলেবেলায় কেন, বুড়োবেলা পর্যন্তই সন্ত্রস্ত থেকেছে সমররা।

অভ্যাস জিনিসটাই মজ্জার গভীরে ঢুকে পড়ে সংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। সমর তো বড় জ্যাঠামশাইয়ের বড় ছেলে বড়দাকে পর্যন্ত কী সমীহ মান্য করে

চলে এসেছে। সংসারের অন্দরে ভাঙন ধরলেও প্রত্যক্ষে অভ্যস্ত নিয়ম-গুলোই চালু ছিল। এখন আর সে ব্যবস্থার প্রত্যাশা নেই।

সমর তাই সেই পরিচয় চায়, যেখানে হতমান্য হয়ে পড়ে থাকবার প্রশ্ন নেই। নিজের তৈরি বাড়িতে 'বাড়ির কর্তা'র পরিচয়ের গৌরবময় জীবনের স্বপ্ন তার অনেক দিনের।/

জমি-বাড়ি কেনা-বেচার সূত্রে সে স্বপ্ন সুলভ প্রাপ্যের মূর্তিতে ছায়া ফেলে ফেলে অবশেষে একখণ্ড জমির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

প্রতীক্ষার শখের কথা সমর আগে কোনো দিন টের পায় নি, শখ ওর নিজেরই। কেনা-বেচা তো শহরতলি অঞ্চলেতেই। সেখানে নতুন নতুন সব ছবির মতো সুন্দর সুন্দর বাড়ি গজিয়ে উঠছে রোজ রোজ। সেই সব সুন্দর বাড়ির গেটে বাড়ির মালিকদের মদগর্বি ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সমর। দেখে কুকুর নিয়ে ঘোরাফেরা করতে। অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়ও আছে, আবার মুখে 'বড় অফিসার'এর ছাপমারা যুবক মালিকও দেখে। বিশ্বনস্যাৎ ভঙ্গী নিয়ে ট্রাউজারের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে ঈষৎ আড়-বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, অন্য হাতে অলসভাবে গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন পৃথিবীর কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না।

এ ছবি সমরকে তাড়না করে ফেরে।

এই ভঙ্গী, এই দৃষ্টি অর্জন করা যায় শুধু অভিজাত অঞ্চলে একখানি বাড়ি করে ফেলতে পারলে। অবশ্য গাড়িও ওই ছবির অন্তর্গত। বিশেষ ভূমিকা আছে তার। তবে ওটা পরের কথা। অবশ্য বাড়ির প্ল্যানের মধ্যে 'গ্যারেজ' আছে।

এই সমস্তই তিলে তিলে গড়ে তুলে তার পরে প্রকাশ করবার ইচ্ছেটা ভেস্তে গেল, বেফাঁস একটা কথা বলে ফেলে। রণুর সম্বন্ধে ওভাবে কথাটা না বললেই হতো। প্রতীক্ষার প্রতিজ্ঞাটা যে মারাত্মক লাগল। বলে কিনা, 'রণু শুধু তোমারই ভাই, আমার কেউ নয়, বেশ। এ-কথাটা সব ক্ষেত্রে মনে রাখবো।' সর্বনাশ। সংসারের পরিস্থিতি তা হলে কী হয়ে উঠবে কে জানে? সমরের এই নিশ্চিন্ত শান্তির জীবনটার ওপর কী চাপ এসে পড়ে হয়তো তার পরিকল্পনাকে বিঘ্নিত করবে। হয়তো যে সমর জড়িয়ে পড়ার

ভয়ে প্রতীক্ষার মেয়েমনকে 'মা' হতে না দিয়ে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সেই সমরকেই সুব্যবস্থা হওয়ার আগেই বৌ ঘাড়ে নিয়ে ভাসতে হবে। অতএব চেপে রাখা কথা বলে ফেলতে হলো। ভেবেছিল, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলো কই ?

প্রতীক্ষা আবার অন্যদিকে চোখ ফেলতে চায়।

সত্যি বটে সমর অসততা অসাধুতার পথ ধরে নি, কিন্তু কখন কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় কে বলতে পারে ? পরিকল্পনাকে দ্রুত কার্যকরী করে তুলতে হলেই টাকা চাই। অনেক টাকা। সেই অনেক টাকা তো চট করে সোজা পথে এসে পড়ে না। তেমন সুযোগ-সুবিধে এলে, এবং ধরাটরা পড়ে যাবার ভয় না থাকলে, সমর যে একেবারে যুধিষ্ঠিরেব ভূমিকা নিয়ে বসে থাকবে এমন গোঁয়ার-প্রতিষ্ঠা তার নেই।

এই যে ব্যবসা। এও তো এক ধরনের অসাধুতাই। দশ হাজারের জিনিস বিশ হাজারে বেচবার দাঁও খুঁজে বেড়ানোও কিছু মহৎ কর্ম নয়।

কিন্তু এসব কথা প্রতীক্ষাকে বোঝাতে যাবে কে ?

রণ্ যে বলে, 'বৌদি আমাদের একখানি আগ্‌মার্কা মেয়ে।' ঠিকই বলে। অতএব এখন সমরকে অন্য পথে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করতে হয়।

বলতে হয়, 'তুমিই যদি খুশী না হও, আমার এতো চেষ্টার দরকার কি ? বাড়ি তো মেয়েদেরই। আমাদের পুরুষের জীবন তো কাটে রাস্তায় রাস্তায়। ...ঠিক আছে জমিটা বেচেই দেবো। ধার যা হয়েছে শোধ করে ফেলে নিশ্চিন্ত হবো। এতো চুপিচাপি, এতো হিসেব-নিকেশ কিছুই আর দরকার হবে না।'

প্রতীক্ষার বরের যে প্রতীক্ষার জন্যে এমন একখানি কোমল মমতাময় হৃদয় লুকনো ছিল, এ খবর কোনো দিন জানতো না প্রতীক্ষা।...প্রতীক্ষা অভিভূত হয়ে গেল। ভাবলো, সত্যিই বটে, এর মধ্যে প্রকাশের অভিব্যক্তিটা তো কমই ! ভাইকে ও তো বুঝতে দেয় না ভিতরের ভালবাসাটা।

প্রতীক্ষা যেন লজ্জিতও হলো, মানুষটাকে এতোদিন ঠিক চিনতে পারে নি ভেবে।

আবার সেই সৃষ্টিকর্তার কারসাজি।

সেই—মমতার কাছে দুর্বল হয়ে যাওয়া। দুর্বলতার হাতে আত্মসমর্পণ !···

সন্দেহ নেই সৃষ্টিকর্তা লোকটা জাতে পুরুষ বলেই স্বজাতির সুবিধের জন্যে সৃষ্টিকালে মেয়েদের মধ্যে এই মমতার বীজটি বুনে রেখেছেন।

মমতায় বন্দিনী প্রতীক্ষা বরের কাছে সরে এলো।···সমরের কোলের উপর একটা হাত রাখল। আস্তে আস্তে বললো, রাগ হয়ে গেল বুঝি ?

সমর আর একটু সুতো ছাড়ল।

ঈষৎ ভার গলায় বললো, না, তোমার ওপর রাগের প্রশ্ন নেই। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে বোকামির জন্যে। কেন যে সারপ্রাইজ দেবার শখে গোড়া থেকেই তোমার কাছে চাপতে গেলাম।···বৃথা কতকগুলো দিন মিথ্যে স্বপ্নের পেছনে ছুটে ছুটে—যাক গে—জমিটা বেচেই দেবো।

আরও মমতা, আরও দুর্বলতা।

প্রতীক্ষার কণ্ঠে তাই বিদ্যুতের আভাস !

ঈস ! তা আর নয়। কেনা জমি বেচে দেবে ! দিলেই হলো ? ও তো আমার জিনিস, আমার বাগানের জন্যে কিনেছ—

এর পর আর কি ? অতঃপর যা হবার তাই।

অনেকক্ষণ পরে সমর ঘুমিয়ে পড়ার আগে আবার কথা তুললো—

বুঝতে পারলে তো, কেন এক্ষুনি জড়িয়ে পড়তে চাইছি না ?·· সব রাগ জল করে দেওয়া অন্তরঙ্গতার সুরে আস্তে বলে, নইলে আমারই কি লোকেদের ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দেখলে ইচ্ছে করে না ? বাড়ি তৈরির চিন্তা আমার ভবানীপুরের বাড়িতে থাকতে থাকতেই। বাবা যা করছে করুক, প্রত্যেকেরই নিজের ভাবনা ভাবা উচিত। জয়েন্ট ফ্যামিলির শেষ পরিণাম তো দেখলামই। জ্ঞানাবধিই দেখে আসছি, ওপরে একতা, ভেতরে তিক্ততা। ···শেষটায় রণুটার সঙ্গেও কি আমার ওই রকম হয়ে যাবে—চুপ করে গেল।

প্রতীক্ষা একটু হাসল, ছেলেরা যদি বিয়ে না করে, তাহলে কোনো ঝামেলার আশঙ্কা নেই।

চমৎকার। বেশ বলেছ।

ঠিকই বলছি। ভাইয়ে ভাইয়ে তো কিছু হয় না, যত ঝঞ্ঝাট বাধায় তো বৌরা এলে।

সমর হেসে বললো, যাক আমারটা তো এসে গেছে, এখন তেমন আইন পাশ হলেও ক্ষতি নেই।

প্রতীক্ষার সমস্ত দিনের সংকল্প বৃথা হলো। কিছুতেই বলে উঠতে পারল না সকালে কী অপমানের দাহে জ্বলেছে সে। বলতে পারল না, 'স্বাধীনতা' নামের একটা জমকালো জামা পরে বহির্জগতে ঘুরে বেড়ালেও, কী পরাধীন এখনো মেয়েরা।...

এখন আবার বিছানাটা অসহ্য লাগল।

সমরের পরিতৃপ্ত নিদ্রাতুর শরীরটার দিকে তাকাতে ভালো লাগল না। উঠে এলো তার কাছ থেকে। এসে জানলাটা খুলে দিয়ে দাঁড়াল।...এখন লালবাড়ির জানলা থেকে ছায়াটা সরে গেছে।...প্রতীক্ষা জানে এ ছায়া সেই 'চাকরি করা মেয়ের।'...নীহারকণার অতি কথন থেকেই জানা

ওই মেয়ে প্রতীক্ষার থেকে বয়েসে অনেক বড় হলেও, এখনো বিয়ের স্বপ্ন দেখে।...অথচ ওর বাবার নাকি কুলশীল গণগোত্র ঠিকুজি কোষ্ঠী ইত্যাদি করে এতো রকম খুঁতখুঁতুনি সে মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে প্রায় অসম্ভবের কোঠায় ঠেলে রেখেছেন।...মেয়ে ক্রমশ বুড়িয়ে যাচ্ছে।

চুরি করে দাম্পত্য জীবনের একটুকরো ছায়া, এতোটুকু আভাস দেখবার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।...আর মাঝে মাঝেই বেড়াতে এসে ইচ্ছে করে প্রসঙ্গ টেনে এনে গল্প করে, 'আমার ভাই এতো ঘুম যে, রাত নটার মধ্যেই অর্ধেক রাত। খাওয়াটা শেষ হতে যা দেরি।'

প্রতীক্ষা ভাবল, এও কী আশ্চর্য পরাধীনতা।

চাকরি করে নিজের জামা-কাপড় নিজে কেনে, ইচ্ছেমত সিনেমা যায়, শুধু এইটুকুর নামই কি স্বাধীনতা ?

শৃঙ্খল ভাঙবার স্বাধীনতা আছে ?

আছে শৃঙ্খলা ভাঙবার ?

স্বাধীনতা কেউ হাতে তুলে দেয় না। 'সমাজ' যতই ভাবুক, কতো স্বাধীনতা দিয়েছি মেয়েদের! ওটা দেবার জিনিস নয়। 'নেবার' জিনিস।

আপন কারাগারে বন্দিনী মেয়েরা পারে না প্রিয়জনকে দুঃখ দিতে, গুরুজনকে অসন্তুষ্ট করতে, আর সর্বোপরি নিন্দে সইতে। পাছে লোকে কিছু বলে।···তাই সে শুধু স্বপ্ন দেখে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লাট্টু নামের মেয়েটা?

তারই কি সাধ্য হবে শৃঙ্খলা ভাঙবার?

অথচ পুরুষের—

ভাবতে ভাবতে চিন্তার ধারা অন্য পথে যায় প্রতীক্ষার।

সমরের এই দীর্ঘকাল যাবত নিঃশব্দ মন্ত্রগুপ্তির সাধনার কথা ভেবে অবাক্ হয়, আর ভাবে, সমরের ওই পরিকল্পনা কাজে পরিণত হলে তো আর গোপন থাকবে না! তখন তো লোকে ওকে 'স্বার্থপর' বলবে, কর্তব্যজ্ঞানহীন আর হৃদয়হীন বলবে।···কিন্তু সত্যিই কি ও তাই?···

তা তো নয়, ও শুধু নিজের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আর বিশেষ 'জীবনদর্শন' নিয়ে নিজের পথে চলছে।···কে কি বলবে, অতো ভাবছে না।···

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন চমকে থেমে গেল প্রতীক্ষা। কিন্তু ওকে কি কেউ কিছু বলবে?

সমরবিজয় চৌধুরী নামের ওই লোকটাকে?

সম্ভাবনাময় সমস্ত মুখগুলো মনের আয়নায় ভেসে ভেসে ওঠে।···নাঃ! সমরকে কেউ কিছু বলবে না। বলবে প্রতীক্ষাকে।···বলবে, ছি ছি! এই তুমি? দেখতে যেন কতই ভালো মানুষ। ভেতরে ভেতরে এতো প্যাঁচ।··· বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়াকে ফেলে রেখে বরটিকে হাতিয়ে নিয়ে 'আলাদা' হয়ে গেলে?···তলে তলে নিজের বাড়ি বাগান সব কমপ্লীট্। কী সাংঘাতিক! কী অবিশ্বাস্য।

অতঃপর আজকালকার মেয়েদের সম্পর্কে ঢালাও সমালোচনা চলতে থাকবে। তারা অস্থির. অধৈর্য, অসহিষ্ণু!···এতো স্বাধীনতা পাচ্ছে, তবু আরো কী চায়?···

প্রতীক্ষা মনে মনে বলে. কিন্তু আমি? আমি তো শৃঙ্খলা ভাঙতে চাই নি।

আমি অন্য কোথাও বাগান করতে যেতে চাই নি। আমি এখানেই গোলাপ রজনীগন্ধার চারা পুঁততে চেয়েছিলাম।···চেয়েছিলাম সবাইকে ভালবাসতে আর ভালবাসা পেতে।

অনেক পরে আস্তে এসে শুয়ে পড়ল।

আর ঘুমিয়ে পড়ার পর একটা কষ্টের স্বপ্ন দেখল।···দেখল রাত্রে কখন খুব ঝড় হয়ে গেছে, সকালে উঠে দেখতে পাচ্ছে রণুর আনা আর কষ্ট করে পোঁতা চারাগুলো সব ভেঙে ছিঁড়ে ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে।···কিছু চার ছিল ফুলসমেত, সেই ফুলগুলো কাদায় বসে বসে গেছে পাপড়ি ছেঁড়া হয়ে।···

দাওয়ার ধারে রণু দাঁড়িয়ে রয়েছে বোকার মতো সেই দিকে তাকিয়ে।

রণুর সেই মুখটা দেখে ভীষণ কষ্ট লাগল প্রতীক্ষার।

ঘুম ভেঙে গেল।

এ রকম স্বপ্ন দেখল কেন প্রতীক্ষা ?

প্রতীক্ষা কি কোনো সময় ভেবেছিল, চারাগুলো উপড়ে ফেলে দেবে ? মনের নিভৃতে ? অবচেতনে ?

১৬

ইউনিভারসিটি থেকে বেরিয়ে রণু 'সূর্যবাণী' অফিসে এসে ঢুকল। 'সূর্যবাণী' দাবি করে বাংলা সাহিত্যাকাশে একমাত্র নির্ভীক সূর্য এই 'সূর্যবাণী'। আরো অনেক ভালো ভালো বিশেষণ দেয় কর্মকর্তারা নিজেদের পত্রিকা সম্পর্কে। রণু হাসে।···তবু রণু মাঝে মাঝে এই 'সূর্যবাণী' অফিসে আড্ডা দিতে আসে।

বারোজন সম্পাদকমণ্ডলীতে গঠিত এই বত্রিশ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক হচ্ছে রণুর বন্ধু শশাঙ্ক। কলেজ ম্যাগাজিনে একবার রণুর একটা প্রবন্ধ বেরোয়, 'এই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কি ?'

সেই প্রবন্ধের বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে ম্যাগাজিনের সে বছরের সম্পাদক

শশাঙ্ক বোস নিজে থেকে যেচে অধিক আলাপ করে ফেলে। তদবধি বন্ধুর পর্যায়ে কাটিয়ে আসছে দু'জনে।…রণু রিসার্চ স্টুডেন্ট আর শশাঙ্ক একখানা কাগজ বার করেছে। রণুকে লেখা দেবার জন্যে বলে শশাঙ্ক। প্রবন্ধ নয় কবিতা।

রণু হো-হো করে হেসেছিল।

কবিতা।

কিন্তু শশাঙ্কর যুক্তি হচ্ছে প্রবন্ধ আর কবিতায় তফাত কিছু নেই। অবিরাম প্রবাহিত চিন্তাধারার খানিকটা অথবা তাৎক্ষণিক কোনো অনুভূতির ধাক্কাটাকে মুঠোয় চেপে ধরে, দৃঢ় সংবদ্ধ করে উপস্থাপিত করা! এই তো! বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গী আঙ্গিক ভাষা ও দুইয়েরই এক। অতএব—

অতএব আজ রণু একটা 'কবিতা' নিয়ে এসেছে।

বুদ্ধিটা দুষ্ট।…যদি নেহাত বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে না দেয় শশাঙ্ক, তাহলে প্রকাশিত সংখ্যাটা নির্ঘাৎ রণুর পরিচিত মহলে আলোড়ন তুলবে। সে আলোড়নে হয়তো ভিতরের 'সূর্যবাণী' উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে কিছু সুরাহা ডেকে আনতে পারে।

শশাঙ্ক বলে উঠল, ওঃ খুব যা হোক। সেই অবধি আর এলিই না! তোকে কবিতা লিখতে হবে না বাবা! দরকার নেই। আড্ডা দিতেই আসিস।

রণু বললো, হবে না মানে? দুর্দান্ত একখানা কবিতা পকেটে নিয়ে ঢুকলাম, আর এখন বলছিস দরকার নেই? এটা অপমান করা তা জানিস?

ও গড্! শশাঙ্ক লাফিয়ে উঠে ওর প্যান্টের পকেটে হাত চালিয়ে বললো, সত্যি, না ধাপ্পা দিচ্ছিস?

বলেই টেনে বার করল একটা সরু স্লিপ। কাটাকুটিতে ভরা। এটা অবশ্যই কায়দা। গুছিয়ে-গুছিয়ে একটা ভালো কাগজে ফ্রেশ করে লেখাটা যেন ছেলেমানুষী। যেটাকে 'কিছু না'র মতো অবহেলায় সম্পাদকের টেবিলে ফেলে দেবে, সেটাতে যত্ন মানায় না।

শশাঙ্ক দেখল বুঝলও, তবু বললো, কী এ? বাজারের, ফর্দ?

রণু বললো, চা আনা।

তারপর বললো, কাগজটা তাই বটে। ওটাই সামনে পেলাম।

শশাঙ্ক একবার চোখ বুলিয়েই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল, মানে পড়ে ফেলল।

॥ জীবনের স্বরূপ ॥

জীবনটাকে লাট্টু ছাড়া আর কোন্ তুলনায় ফেলা যায় ?
স্রেফ একটা রংচঙা লাট্টু। অথবা রংচটা।
যেমনই হোক্ ধর্মটা একই—
ছুঁচলো সরু 'আল'টার ওপর—
মাথাভারী শরীরটাকে নিয়ে পাক খেয়ে চলেছে।
চলেছে, চলবে, যতক্ষণ না 'লেত্তি'র প্যাঁচটা থেকে
মুক্ত হতে পারে।
লেত্তিটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বুক পর্যন্ত উঠেছে ওর।
উল্টোপাক খেয়ে ঘোরা ছাড়া—
উদ্ধারের আর উপায় নেই।
জীবনটাকে লাট্টুর সঙ্গে তুলনাটা, আমার
বেশ জুতসই লাগে।
ছুঁচলো সরু আলটার ওপর মাথাভারী দেহখানা
নিয়ে উল্টোপাক খেয়ে চলেছে লেত্তিটা থেকে
বেরিয়ে আসার জন্যে।

শশাঙ্ক বললো, তোর 'হতে' পারে।

গুড! তা হলে ছাপাচ্ছিস ? রণু চোখ কুঁচকে তাকাল।

এই তো প্রেসে দিতে চললাম।

কোন্ মাসে ?

কোন্ মাসে আবার ? এই সামনের মাসেই। আষাঢ়ে।

আষাঢ়ে! কী সেটা ? সাদা বাংলায় বল বাবা।

সাদা বাংলায় হচ্ছে, ফার্স্ট উইক অফ জুলাই।

জুলাইটা সেপ্টেম্বরে বেরোবে না তো ?

সবই নির্ভর করছে খোদাতালার মর্জির ওপর, শশাঙ্ক বললো, লোড-শেডিং, কাগজের ঘাটতি, প্রেস স্ট্রাইক, এই ত্রিশক্তি সম্মেলনের সঙ্গে লড়ে চলব,

যা হয়।

ওইটুকু তো কাগজ ! এতো কী ?

ওইটুকুতেই জান্ কয়লা হয়ে যায় হে ব্রাদার। জানো না তো, কতো ধানে কত চাল।

রণু বললো, কে সেধেছিল ম্যাগাজিন বার করতে ?

শশাঙ্ক বললো, ওই তো প্রশ্ন ! কে সেধেছিল ! জানি না। লাভের কথাই ওঠে না, লোকসানের মাত্রাটা মাত্রা না ছাড়লেই ভাবি পরমলাভ।

রণু বললো, ঘাড়ে ভূত না চাপলে আর কেউ ম্যাগাজিন বার করতে বসে না।

শশাঙ্ক হাসল, তোর সঙ্গে আমি একমত। যাক, লাট্টু লেত্তি ঘুড়ি লাটাই যা পারবি, লিখে-টিকে নিয়ে আসবি।

ভাবছি - লাট্টুরই একটা সিরিজ চালাই—

অর্থাৎ ?

সেটা অবশ্য এখনো ভেবে দেখি নি। ধর, 'ভালবাসা' ভালবাসাকে আমি লাট্টুর সঙ্গে তুলনা করি।

১৭

"সূর্যবাণী" কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে হাঁটছে, ঘ্যাচ করে ঘাড়ের কাছে একখানা গাড়ি থেমে গেল একেবারে ফুটপাথের গা ঘেঁষে। পালিশ চকচকে তেল পিছলানো গাড়ি। চকোলেট কালার।

রণু না ?

রণু চমকে তাকাল।

গাড়ির মালিক গাড়ির দরজাটা খুলে ধরে বললো, উঠে এসো। চিনতে পারছ না বুঝি? ভাবছ কিডন্যাপ করে নেবার মতলব? আমি অনিন্দিতার কাকা! কান্তিকুমার রায়।

রণু অবশ্য তত্ক্ষণে উঠে পড়েছে গাড়িতে।

কান্তিকুমার বললো, সেদিন লাঞ্চে এলে না তো ?

রণু লজ্জিত হলো।

বললো, ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারি নি।

যে কোনোদিন চলে এসো না। লাঞ্চে ডিনারে টী-তে অথবা এমনি যখন খুশী। তোমার চেনা লোকেরা রয়েছেন।

রণুর লক্ষ্য পড়ল সেদিন ভদ্রলোক 'আপনি' করে কথা বলেছিলেন। আজ অধিক আত্মীয়তার ভঙ্গী।

রণু আরো লজ্জিত হচ্ছে। লোকে তো বেশ সহজে সহজ হয়ে যেতে পারে।

বললো, প্রায়ই ভাবি—

ভাবনাটা কাজে করে ফেলবে। এখন যাচ্ছিলে কোথায়?

বাড়িই ফিরছি—

বাড়ি!

কান্তিকুমারের কণ্ঠ দ্বিধাগ্রস্ত, দেরি হলে মা-বাবা ভাবনা করবেন?

রণু হাসল, তা কিছু নয়। দেরিটাই আমার স্বাভাবিক। বরং তাড়াতাড়ি ফিরলেই মা ভাবতে বসে শরীর খারাপ নাকি।

কান্তিকুমার আস্তে বলে, মা! বাড়ি ফেরার সময় ভাবতে খুব ভালো লাগে সেখানে মা আছে। তাই না?

রণু শুধুই একটু হাসল।

কী বলবে? মা থাকাটাই অভ্যাস, ও নিয়ে বিশেষ করে ভেবে দেখে নি। বলা যায় না।

কান্তিকুমার নিজেই ড্রাইভ করছে। আস্তে স্টীয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ বলে ওঠে, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে মানুষ হওয়া ছেলেদের আমার খুব 'লাকি' মনে হয়।

রণু বললো, কোন্ দিক থেকে?

মনের দিক থেকেই বলছি- লোন্‌লি ফীল করার কোনো প্রশ্ন নেই। নানা রকম সম্পর্কের সব আত্মীয় থাকায়, নানা স্বাদের ভালবাসা জোটে। কাকা জ্যাঠা ঠাকুর্দা ঠাকুমা কাকী জ্যেঠি, দাদা বৌদি, পিসিমা-টিসিমা, ওঃ। এ তো এক রকম ওয়েলথ্। এই যে আমার বৌদি, তোমাদের কী

রকম যেন পিসি হন, তোমাদের কাছে থেকেছেন। উনি যে নিজের পিসি নয়, এটা তো কোনোদিন ভাবতেই পারো নি। তাই না?

রণু মনে মনে হেসে বলে, এতোদিন পারি নি, এবার লড়ুয়ে মনোভঙ্গী নিয়ে ভাবতে বসেছি। মুখে বলে, সে তো নিশ্চয়।

আমরা কিন্তু আমার ওখানেই যাচ্ছি।

চলুন, যাওয়াই তো হয় না।

১৮

বিভা বললো, খুব ছেলে যা হোক। তোর ওপরই একটু আশা ছিল বাবা, তুইও ডুব মেরে রইলি। আর তো কেউ একবার উঁকিও দিলো না। এক এক সময় ভারী আশ্চর্য লাগে জানিস?

রণু লাট্টুর দিকে অলক্ষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো, কী আশ্চর্য লাগে?

এই যে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ যাদের সঙ্গে জীবন কাটে, যাদের জীবনের ছোট বড় সব কিছু সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে থাকা হয়, চোখের আড়াল হওয়া মাত্রই তারা স্মৃতি থেকে মুছে যায় কী করে?

রণু বললো, মুছে যায় কে বললো?

বিভা একটু ঝঙ্কার দিলো, বলবে আবার কে? দেখতে পাওয়া যায় না?

রণু হাসল, দিব্যদৃষ্টি থাকলে আলাদা কথা, নইলে সবটা কি দেখতে পাওয়া যায়?

ব্যাভারেই ছাখা যায়। অথচ আমি তো সত্যি বলতে দিন-রাত ভবানী-পুরের সেই বাড়িখানায় পড়ে আছি?

বলো কি বিবোপিসি? এই স্বর্গরাজ্যে বসে? তোমার এই ঘর-টর দেখলে তো তোমার মেজদার চোখ ট্যারা হয়ে যেত। আসে না তাই।

বিভা বললো, চেয়ার টেবিল কৌচ কেদারা কার্পেট পর্দা, এই সবই কি স্বর্গ?

রণু বললো, নির্ঘাৎ। এই স্বর্গের পেছনেই তো ঘুরে মরছে সবাই।

সেই তো—

বিভা অন্যমনস্ক ভাবে বলে, দেখছে বুঝছে ওর মধ্যে কোনো সুখ শান্তি নেই, তবু সেই দিকেই ছুটছে। এই যে লাট্টুকে এখন ওর কাকা বেশী উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য বিলেত পাঠাবার তাল করছে— কী লাভ ?

রণু চমকে উঠে বলে, কোথায় পাঠাবার ?

ওই তো বিলেত না আমেরিকা কোথায়। বল না লাট্টু ?

লাট্টুর দিকে তাকিয়ে দেখে রণু, ক্রুদ্ধ আক্রোশের দৃষ্টিতে। ওঃ তাই আজ এমন চুপচাপ। মাকে একটানা কথা বলতে দিচ্ছে। নইলে মায়ের কথার উপরে তো কথা চাপান দেওয়াই অভ্যাস।

এখন কথা বললো, তুমিও যেমন মা! তুমি নিজেই যে সেই বলো না, রাধাও নেচেছে, সাত মণ তেলও পুড়েছে তাই। কী এমন রেজাল্ট করবো আমি যে নেবে তারা ?

রণু প্রায় ক্রুদ্ধ গলাতেই বলে, রেজাল্টে কী আসে যায় ? গাধার গলায় টাকার থলি বেঁধে দিয়েও প্লেনে তুলে দেওয়া যায় 'হায়ার এডুকেশনে'র জন্যে।

লাট্টু হঠাৎ হেসে উঠে বললো, এই বাজে কথাটা শুনে তুমি খুব রেগে গেলে মনে হচ্ছে বণুদা।

রণু গম্ভীর হয়ে গেল।

বললো, আমার রাগের কী আছে ? আমার সঙ্গে কী ?

এই সময় কান্তি এলো স্নান সেরে পায়জামা গেঞ্জি পরে। বললো, কী হলো ? ভাইপোকে এখনো চা-টা দাও নি বৌদি ?

এই যে তুমি এলে একেবারে একসঙ্গেই—লাট্টু দেখ তো জয়দেব কী করে উঠতে পেরেছে ?

লাট্টু চলে গেল।

কান্তি বললো, অনুকে 'টোরেন্টো'য় পড়তে পাঠাবার চেষ্টা করছি, রণুকে বলেছ বৌদি ?

বিভা বললো, এই তো সেই কথাই বলছিলাম।

কান্তি উৎসাহিত গলায় বলে, মেয়েটা বেশ ইনট্যালিজেন্ট। ভালো স্কুল কলেজে পড়তে পেলে একটা নামী ব্রীলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হতে পারতো।

যাক সে ক্রটি তো আমারও। তবু জীবনের কিছু কিছু ভুল কারেক্শানের বাইরে চলে গেলেও, কিছু কিছু কারেকশান করা যায়, তাই না ? অন্তত চেষ্টা করা যায়। দাদার ছেলে নেই, মেয়েটাকে নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যাক। বৌদির অবশ্য শুনে মনটন খারাপ হচ্ছে—

বিভা বলে উঠল, কে বললো আমার মন খারাপ হচ্ছে ?

কান্তিকুমার হাসল।

সবই কি আর ডেকে ডেকে বলতে হয় ? তবে ভেবে দেখলাম কী আর করা যাবে। মেয়ের বিয়ে হলেও তো মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। কি বলো হে ? বোঝাও পিসিকে।

রণু বললো, পিসিকে বোঝাবার কিছু নেই। পিসি খুব বুদ্ধিমান।···আচ্ছা আমি উঠি—

সে কি রে ? বিভা বলে ওঠে, লাট্টু খাবার-টাবার দিচ্ছে—

থাক, আর একদিন হবে—

বলে উঠে দাঁড়ায় রণু। এই দণ্ডে ওর মনে হলো, 'সূর্যবাণী' অফিসে গিয়ে কবিতাটা ফিরিয়ে এনে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলে না দিলে ওর শান্তি হবে না।

কিন্তু যাওয়া হলো না।

লাট্টু এসে বললো, কী হলো রণুদা চলে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ একটু কাজ আছে—

লাট্টু এগিয়ে এসে ওর পিঠে আলতো করে হাতটা একটু ঠেকিয়ে শক্ত গলায় বললো, ভদ্রতা রক্ষাটা হচ্ছে ভদ্রলোকের পক্ষে সব থেকে প্রধান কাজ বুঝলে ? তারপর হেসে উঠে বললো, বোকামি কোরো না। মা আজ কাকাকে 'ভবানীপুরী' টিফিন খাওয়াবে বলে সারা দুপুর কি সব বানিয়েছে, শেয়ার পাবে। চল। কাকা চলুন।

কান্তিকুমার তো ততক্ষণে লাফিয়েই উঠেছে।

আরে ! এতোক্ষণ বলতে হয় ? চলো হে চলো। কী বৌদি সেই জিনিসটা বানিয়েছে ? সেদিন যেটা খাওয়ালেন, 'গোকুল পিঠে' নাকি ? ওঃ মার্ভেলাস !

লাট্টুর রণুর তুষ্ণীভাবটা ঢাকবার চেষ্টায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, গোকুল-পিঠে, রণুদারও ওটা খুব ফেভারিট।

রণুর মনে হলো, লাট্টুর কথাবার্তার ধরন অনেক বদলে গেছে। যাবেই তো। আরো যাওয়ার চেষ্টা চলবে। ওদেশের উপযুক্ত হতে হবে তো? রাগটাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না।

১৯

ঝড়টা শুধু স্বপ্নের উপর দিয়েই বহে গিয়েছিল, মাটিতে পুঁতে ফেলা চারা-গুলোর উপর দিয়ে নয়। দিব্যি ঝলমলিয়ে উঠেছে প্রতীক্ষার বাগান। যদিও ওগুলোর পরিচর্যার ব্যাপারে রণুর অবদান প্রতীক্ষার চেয়ে বেশী। প্রতীক্ষা লজ্জা পায়। যখন কেউ সামনে থাকে না, তখন একটু দেখে। আর ভাবে যদি এই ফুটে ওঠা ফুলগুলোর অন্তরালে অনেকখানি দুঃখ অপমান জমাট হয়ে না থাকতো। যদি সেই প্রথম দিনের আহ্লাদের সুরে বাঁধা মনের বাগানে এই ফুলেরা ফুটতে পেতো।

রণুর কাছে কেউ কোনোদিন নিয়মের কাজ পাবার প্রত্যাশা করে না। খুব তোড়জোড় করে দু-তিনদিন বাজার যায়, তারপরই নীহারকণা যেই ফর্দ এগিয়ে দিতে আসেন, বলে, রাখো তোমার আলু পটল কাঁচকলা। রোজ রোজ এতো ফুরোয়, কে খায় এসব? রাবিশ!

কিন্তু দেখা গেল এই বাগান সম্পর্কে দস্তুরমতো নিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে রণু, জল-টল দিচ্ছে। মাটি খুঁড়ছে।

প্রতীক্ষা বলে, থাক না ভাই, আমি স্কুল থেকে ফিরে দেখব ওসব—

রণু বলে, রোদের সময় জল দিলে গাছেদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

প্রতীক্ষা চলে যায় স্কুলে। নীহারকণা বলেন, তোর ঘাড়েও কি ভূত চাপলো রণা?

রণু বলে, পঞ্চভূতের শরীর মা, এক আধটা ছিটকে বেরিয়ে এসে ঘাড়ে চাপলে আশ্চয্যি কি? এই দ্যাখো না, তোমার ঘাড়ে চাপা ভূত, এই সুন্দর গোলাপ গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তুলসী গাছের জঙ্গল বানিয়ে

ফেলেছে।

হরি! হরি! তুলসীকে জঙ্গল বলছিস?

নীহারকণা বলে ওঠেন, হিন্দু বাঙালীর বাড়িতে একটা তুলসী গাছ থাকবে না?

থাকতেই হয়?

হয় না? ও বাড়িতে দেখিস নি ছাতে পুজোর ঘরের সামনে টবে? বোশেখ মাসে ঝারা দেওয়া হতো, কার্তিক মাস ভোর পিদিম দেওয়া হতো।

ভুবনবিজয় আজকাল একটা অসমসাহসিক কাজ করেছেন। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে একখানা নাটক লিখতে শুরু করেছেন। নীহারকণার তাতে মেজাজ গরম। বলেন, চিরটাকাল 'আপিস আপিস' করে একবার পরিবারের পানে তাকিয়ে দেখলে না। পাঁচজনের সংসারে চক্ষুলজ্জার দায়ে বৈঠকখানা বাড়িতেই আড্ডা, এখন সকল কাঁটা ঘুচলো তো, নাটক লিখতে হলো।···আমার কেন মরণ হয় না তাই ভাবি।

ভুবনবিজয় তখন তাড়াতাড়ি খাতাপত্র রেখে ভুবনবিজয় হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলেন, সর্বনাশ। আমার এক্ষুনি মরতে ইচ্ছে নেই!

তোমার কথা কে বলছে?

তুমিই বলছো। তুমি মরলে আমাকেও তো সহমরণে যেতে হবে গো। তুমি হীন পৃথিবী! ওরে বাবা!

ন্যাকামি কোরো না বলছি। ভালো হবে না।

ভুবনবিজয় বলেন, আমার ভালো আটকায় কে? নাটক লিখি হাতে, মন থাকে তোমাতে।

ঢং। নীহারকণা থপথপিয়ে চলে যান রেগেমেগে।

আর ভুবনবিজয় নিজের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে যখনি নীহারকণার কণ্ঠস্বর কানে আসে তখনি কোনো একটা কথা বলে ওঠেন। এখন তাই বলে ওঠেন, ঠিক। কারেক্ট। চৌধুরী বাড়ির ছেলে হয়ে এটা জানিস না? তুলসী পাতার কতো গুণ! ওটা তো একটা ভেষজ! ওষধি বৃক্ষ। সর্দি কাশি সারে, ইয়ে ক্ষুধাবর্ধক। আরো অনেক গুণ।

আবার তলিয়ে যান খাতাপত্রে।

কিন্তু হলো না, রণুর ডাক শোনা গেল, বাবা কাঁচালঙ্কায় গুণ কয় প্রকার ?

ভুবনবিজয় খাতা হাতে উঠে এলেন, কী বলছিস ?

বলছি কাঁচালঙ্কার মধ্যে কি কি গুণ বর্তমান ?

ভুবনবিজয় বললেন, তোর কথার মাথামুণ্ডু বুঝছি না বাবা।

রণু ডালিয়া গাছের পাশ থেকে একটি ছোট্ট টুকটুকে লঙ্কা তুলে নিয়ে এসে তুলে ধরে বলে, এই যে ডালিয়া গাছের সঙ্গে সহাবস্থান করছিল। শ্রীমতী নীহারকণা দেবীর অবদান। এটাও কি হিন্দু বাড়িতে অপরিহার্য ? না কি ভেষজ ?

এতোক্ষণে ভুবনবিজয় কথাটার মানে বুঝতে পারেন। আর পেরেই হা-হা করে হেসে ওঠেন, কী গো ওটিকে আবার কখন ওর ফাঁকে পুঁতে রেখেছিলে ?···রণু তোর মায়ের হাতের গুণ আছে বলতে হবে। এক চান্সেই ফলপ্রাপ্তি। কী জাতের লঙ্কা গো ? ধানী ? না সূর্যিমণি ?

রণু বললো, বাজার থেকে আনা মালেই অস্থির আবার বাড়িতে লঙ্কার চাষ ! সেলাম মা জননী, তুমিই দেখালে।

নীহারকণা নিরুপায় ক্রোধে গনগন করতে থাকেন।

কথায় তো পারবেন না ওর সঙ্গে !

বড় ছেলে তো অনেক দিনই খরচের খাতায় উঠে গেছে। সমরকে আর নীহারকণা 'আমার ছেলে' বলে ততটা ভাবতে পারেন না, যতটা 'বৌমার বর' বলে ভাবেন, কিন্তু এই ছোট ছেলেটা ! এটাকে তো এখনো নীহারকণা খরচ করে ফেলেন নি, তবু এ এমন ব্যবহার করে কেন ? রাগে দুঃখে নীহারকণার গা 'রী রী' করে। একটা বৌ এসে নীহারকণার দুটো ছেলেকেই আঁচলে বেঁধে ফেললো গো! কোনো কিছুতেই আঠা নেই এ ছেলের, বৌদির বাগানে কী আঠা। গেরস্তর অতটা জমি বৌ দখল করে নিয়েছে, নীহারকণা তার কোণে খাঁজে দুটো তুলসী গাছ কাঁচালঙ্কার গাছ পুঁতেছেন বলে এতো হাসি মস্করা। বেশ করবেন পুঁতবেন। কেন সংসারে তাঁর কোনো দাবি নেই ? সবই তো তাঁর।

কিন্তু এসব কথা তো মুখে উচ্চারণ করা চলে না। তাই রুষ্ট গলায় বলেন, তা দে উপড়ে ফেলে। মায়ের জিনিসে যখন এতো হাসি-ঠাট্টা।

উপড়ে ফেলে ? সর্বনাশ ! প্রাণের ভয় নেই আমার !

রণু দু'হাত কপালে ঠেকায়।

কিন্তু এইখানেই কি শেষ ?

বিদুষী বৌদি বেঁটে ছাতা মাথায় দিয়ে ব্যাগ দুলিয়ে ফেরা মাত্রই বলে ওঠা হলো, বৌদি তোমার ফুলবাগানে ফলও ধরতে শুরু করেছে।

প্রতীক্ষা অবাক হয়ে তাকাল, ফল !

এই যে —

সেই লঙ্কাটা এনে সামনে ধরে রণু। বলে ওঠে, একেই বলে বাড়ি। ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ, ওষধিবৃক্ষের সমারোহ।

ওষধি বৃক্ষ !

বাঃ তুলসী গাছ কতবড় ওষধিবৃক্ষ জানো না ? কী ঘোড়ার ডিম শেখাচ্ছ ছাই মেয়েগুলোকে ?

প্রতীক্ষা হেসে ফেলে।

নীহারকণার অবদান তার চোখ এড়ায় নি, কিছু বলে নি। বাবার কাছে শুনেছে তুলসীর ঝাড়ের কাছাকাছি থাকলে সুগন্ধি ফুলের গাছের ক্ষতি হয়। কিন্তু ও নিয়ে আর ভাবে না সে। না দেখার ভান করে থেকেছে। লঙ্কা দেখে হেসেছে, ভেবেছে ফুলগাছ ক'টার পাশেই ভাঙা বাঁশ বাখারি আর পুরনো করোগেট শীট্ দিয়ে হাড়কুশ্রী একটা ঘর বানিয়েই ক্ষান্ত হন নি নীহারকণা, তুলসীর চারা লঙ্কার চারা পুঁতে পুঁতে দখলদারের ভূমিকাটা বজায় রাখছেন।

তবু বেহায়া ফুলগুলো ফুটছে।

ডালিয়া কটা দেখবার মতো। সূর্যমুখী সোনা ঢালছে। গোলাপের মাপ-গুলো গৌরবজনক। বেল জুঁই ফুটেছিল অনেক, এখন কমে গেছে। এখন চীনে জবাটা ফুল দিচ্ছে। আর কাঞ্চন ফুলেরা মাথা দুলিয়ে হাসছে।

রণুর যত্নটা বৃথা যায় নি।

যদিও ছুটির দিনে ছাড়া সব শোভাটা দেখতে পায় না প্রতীক্ষা। তাও খুব ভোরে উঠতে পারলে।

ভোর হতে না হতেই গাছ মুড়িয়ে ফুল তুলে নিয়ে পুজোর ঘরে মজুত করে ফেলেন নীহারকণা। আর পুজো হলে আহ্লাদে বিগলিত হয়ে ডাক দেন, বৌমা ছাখো গো—তোমার ফুলে আমার ঠাকুর কেমন সেজেছেন! অন্য দিন তো দেখতে পাও না, যখন ফেরো ঠাকুরের 'শয়ান' হয়ে যায়। ···হ্যাঁ ঠাকুরদের তো দিবানিদ্রারও অভ্যাস।

প্রথম প্রথম—

ভুবনবিজয় বলেছিলেন, আহা হা সব ফুলগুলো তুলে ফেললে? বৌমা এসে দেখতো—খোঁপায় টোঁপায় দিতে ইচ্ছে হতে পারে···নীহারকণা চোখে আগুন জ্বেলে, আর ভুরুতে 'গুণ' টেনে বলেছিলেন, বুড়ো বয়েসে তোমার আর আদিখ্যেতা দেখিও না। ফুলের সার্থক ঠাকুরের চরণে, না মেয়েমানুষের খোঁপায়?

তবে প্রতীক্ষার সামনে নীহারকণা হাস্যবিগলিত, 'গোপালে'র চরণে 'গোলাপ'। দেখো গো বাহার। এখানে এসে পর্যন্ত ঠাকুর শুকনো পড়ে থাকতেন। তোমার বাগানের দৌলতে—

ভবানীপুরের বাড়িতে বরাবর একটা মালির ব্যবস্থা ছিল। নিত্য সকালে ছেঁড়া কলাপাতার মোড়কে মুড়ে চারটি পচা পচা ফুল তুলসী দিয়ে যেত সে। নীহারকণার ওপরেই ছিল সংসারের গৃহদেবতার দেখাশোনার ভার। কারণ চিরদিনই ভারী কাজে অক্ষম তিনি। হাঁড়ি আলাদা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঘরে আলাদা 'ঠাকুর' হয়ে গিয়েছিল। কারো লক্ষ্মীর ঘট, কারো মা কালীর পট, কারো রামকৃষ্ণ সারদামণি।

সাবেকী গোপাল মূর্তিটি নীহারকণাই নিয়ে এসেছেন।

সারা সকালটা বৌ বাড়িতে থাকে না, এটা যেমন অসুবিধে তেমনি সুবিধেও বটে। ইচ্ছেমত বাক্যবিন্যাস চালানো যায়।

বাড়িতে ফোটা ফুল গৃহদেবতার চরণের বদলে পুত-বৌয়ের খোঁপার কথা ভেবে ফেলায়, ভুবনবিজয়কে যে ধিক্কারটা দেওয়া গেল, বৌ বাড়ি থাকলে হতো?

হলদেবাড়ির গিন্নীর সকালবেলাই সময়।

ছেলের বৌ চাকুরে নয়, তথাপি রান্নার লোক আছে। গিন্নীর অগাধ অবসর। তিনি এসে নীহারকণার দুঃখে বিগলিত হন, এবং গলা নামিয়ে নামিয়ে বলেন, কথায় বলে না, 'জগতটা কার বশ ?' না 'টাকার বশ।' সেটা হাড়ে হাড়ে মালুম। এই যে এখনকার বৌ ঝি টাকা উপায় করতে শিখেছে, তাতেই তাদের জয়জয়কার। স্বামী শ্বশুর দ্যাওর ভাসুর সবাই তটস্থ। তাঁরাও সংসারের মাথায় পা দিয়ে হাঁটছেন। আর এই যে গিন্নীরা হাড় পিষে খেটে মরছে, তার কোনো দাম আছে ? তোমার কথাই ধরো না—

নীহারকণা বান্ধবীর স্নেহে বিগলিত হন। তাঁর কাছ থেকেই তো লঙ্কার চারা তুলসীর চারা···তাঁর কাছ থেকেই পাড়ার সকলের হাঁড়ির খবর জানা।

২৫

রণুকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল লাট্টু। চলে যাবার পর সিঁড়ির জানলার ধারে দাঁড়িয়েই রইল অনেকক্ষণ। কী অদ্ভুত ব্যবহার করে গেল রণুদা। কাকাও যেন একটু লক্ষ্য করলেন, আর মা তো বটেই। মা বোধহয় বুঝতে পেরেছে লাট্টুর বাইরে গিয়ে পড়ার চেষ্টার খবর শুনে রণুদা অমন উলটো-পালটার মতো ব্যবহার করল। ভালো ভালো খাবারগুলো অর্ধেক ফেলে দিলো, কথার উত্তর দেওয়া ছাড়া নিজে থেকে মুখই খুললো না আর, শেষ পর্যন্ত বললো, দারুণ মাথা ধরেছে।···কিন্তু মা কি সে-কথা বিশ্বাস করেছে ?

মা হয়তো ভেবে বসবে রণুর মধ্যে হিংসে দেখা দিয়েছে।···আর কি ভাবা সম্ভব ? রাগ আর হিংসের মতোই তো ব্যবহার করল রণুদা।···লাট্টু বুঝতে পারছে, অকস্মাৎ এই অবিশ্বাস্য খবরের ভারটা সহ্য করে নিতে পারে নি রণুদা। ভয়ঙ্কর মন কেমনের ধাক্কাটাই এমন এলোমেলো করে ফেলেছিল ওকে।

প্রথম যখন কাকা কথাটা তুলেছিল লাট্টু অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল। কিন্তু কান্তিকুমার তো আর যে সে ব্যক্তি নয় ? তার ইচ্ছের আর চেষ্টার

দাম আছে।···ব্যাপারটা ঘটতেও পারে জেনে অবধি লাট্টু এক অবর্ণনীয় অবস্থায় কাটাচ্ছে। একদিকে উৎসাহিতও হয়েছে, আবার মার কথা ভাবলে এক বিন্দুও ইচ্ছে করছে না, আর রণুর সঙ্গে দীর্ঘকালের ছাড়াছাড়ির কথা মনে পড়লে সব উৎসাহ ঘুচে যাচ্ছে।

ছাড়াছাড়িটা কি শুধুই দীর্ঘকালের ? ফিরে এসে কি আবার লাট্টু এই অবস্থাটাকে ফিরে পাবে ? চার পাঁচ বছর বিদেশে কাটিয়ে কোন্ লাট্টু এসে দেশের মাটিতে পা দেবে ?···এখন যদিও ভাবছে—ও একেবারেই বদলাবে না, তবু কে বলতে পারে ?···তা ছাড়া লাট্টুর এখনকার এই পরিবেশটারই যে ভয়ানক কিছু পরিবর্তন ঘটবে না, কে বলতে পারে ?

মা কি ততদিন বেঁচে থাকবে ?

যদি মরে যায় ?

রণুদা যদি আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে ?

ভয়ানক একটা যন্ত্রণার মধ্যে কাটাচ্ছে লাট্টু, এই প্রস্তাবের শুরু থেকে।··· কী দরকার এতো উচ্চশিক্ষার উচ্চ আশায় ? সাধারণ জীবনের মধ্যে থাকলেই বা কী ? ভবানীপুরের বাড়ির সেই লাট্টু ! সে বিদেশে পড়তে যাবে। এটা কি একটা সত্যি ঘটনা ?···সেই বাড়ির সবাই, যারা ছিটকে ছিটকে এদিক-ওদিকে সরে গেছে, তাদের সকলের মুখগুলো মনে পড়ছে লাট্টুর। কী বলবে তারা এ খবর শুনলে। কোন্ দৃষ্টিতে তাকাবে লাট্টুর দিকে।

নিশ্চয় ব্যঙ্গ আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে।

ভাববে, যাক খুব একখানা এলেমদার কাকা জুটিয়ে ফেলেছিলি বটে।··· একেই বলে ঘুঁটেকুড়ুনীর মহারানী হওয়া।···

কতবার ভেবেছে কাকাকে বলবে, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।···কিন্তু তাতেও তো লজ্জা। কী বলবে কাকা ? যে মানুষটা এতো টাকার দায় মাথায় নিয়ে এতো চেষ্টা করে এটা ঘটিয়ে তুলছে, তার মুখের ওপর একখানা চড় মারা হবে না কি তাহলে ?

তা ছাড়া—যে 'সাধারণ জীবনের' মধ্যে থাকতে চাইছে সে, সে-জীবনের চেহারাটা কেমন ? কে থাকবে সেই জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ?

কে করে তুলবে অসম্ভবকে সম্ভব ?

ভাবতে ভাবতে দিশেহারা লাট্টু কাকার ইচ্ছের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করে চলেছে।...

তবু রণু এমন অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা করবে ভাবে নি লাট্টু।

সিঁড়িতে নামতে নামতে বললো কিনা, এ কী! আপনি এই দীনহীনকে এগিয়ে দিতে আসছেন! ছি, ছি। শোভা পায় না!

লাট্টু বললো, আজ তোমার কী হলো বলো তো রণুদা? যা তা করছ কেন?

রণু বললো, এখন তোর আমাদের মতো হতভাগাদের সব কিছুই যা তা মনে হবে।

লাট্টু ওর হাতটা চেপে ধরে গভীর গলায় বলেছিল, তুমিই বলে দাও রণুদা কী করবো? যদি বারণ করো যাব না।

আমি? আমি বারণ করবার কে? রণু বলেছিল, কোথায় তুমি, কোথায় আমি।

রণুদা, আমার মনটা তুমি বুঝতে চাইছ না কেন?

তখন রণু তুই করে বলেছিল, বুঝতে না চাওয়ার কিছু নেই। জলের মতন বুঝতে পাচ্ছি। আহ্লাদে ভাসছিস, শুধু একটু লোক দেখানো চক্ষুলজ্জা এই আর কি।

লোক দেখানো।

তবে? আকাশে উড়ে সাগর পার হয়ে যাবি। যারা মাটিতে পড়ে থাকবে, তাদের কাছে কিঞ্চিৎ চক্ষুলজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক। এতোদিন যখন এক মাটিতেই ছিলি। দুঃখ হচ্ছে বিবোপিসির জন্যে।

আমার জন্যে হচ্ছে না?

তোর জন্যে? রণু প্রায় শব্দ করে হেসে উঠেছিল, তোর জন্যে দুঃখ হবে?

হওয়া উচিত ছিল রণুদা।

রণু নিষ্ঠুর গলায় বলেছিল, ন্যাকামিরও একটা মাত্রা থাকা উচিত লাট্টু। যাক—এয়ারপোর্টে সী অফ করতে তো আর গিয়ে উঠতে পারব না, এখান থেকেই টা-টা বাই বাই!

লাট্টু হঠাৎ প্রায় হিংস্র প্রাণীর মতো রণুর কাঁধটা খামচে ধরে বলেছিল, অকারণ মানুষকে অপমান করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই রণুদা। আমার অবস্থায় পড়লে তুমি নিজে কী করতে ভেবে দেখো।

তোর অবস্থায়? পড়তেই পারব না কাজেই ভাবাও সম্ভব নয়।

লাট্টু হঠাৎ কেঁদে ফেলেছিল।

ধরা গলায় বলেছিল, আমার প্রাণের মধ্যে কী হচ্ছে ভগবানই জানেন। আর তুমি এই ভাবে—

আশ্চর্য! তখনো রণু একটু মমতার কথা বলে নি। শুকনো গলায় বলেছিল, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। ও. কে!

রণুদা, আমি কালই যাচ্ছি না। এক্ষুনি বিদায় না দিলেও চলবে। ঢের কাঠ-খড় পুড়বে, তবে যাওয়া। এর মধ্যে আসতে হবে তোমায়। কথা আছে।

হতভাগা অভাগার সঙ্গে আর অনিন্দিতা দেবীর কিসের কথা?

রণুদা তোমার পায়ে পড়ি, এভাবে মনে কষ্ট দিও না। কথা দাও তুমি বদলে যাবে না?

বদলে যাব না? অবিকল অপরিবর্তিত থেকে লাভটা কী হবে? ফিরে আমাকে চিনতে পারবি?

লাট্টু আর পারে নি।

লাট্টুরও তো রক্তমাংসের শরীর। রাগ হয়ে যাবে না?

কড়া গলায় বলে ফেলেছিল, তোমাকেও তাহলে বলি রণুদা নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে।

রণু বললো, ঠিক তো থাকবেই রে। যাকগে—তাহলে আর একবার টা-টা করে দিচ্ছি।

যাবার সময় আমার সঙ্গে এই রকম দুর্ব্যবহার করলে রণুদা? ধরো যদি আমি এর মধ্যে মরেই যাই?

ষাট্ ষাট্ মরতে যাবি কী দুঃখে? বাঁচতে যাবার দেশে যাচ্ছিস।

তুমি আমায় এতো অপমান করছো, তবু বলছি—চিঠি দেবে তো?

চিঠি! মাথা খারাপ।

রণু থেমে গেল।

লাট্টু রাগ করতে পারছে না।

রণুর দুরন্ত অভিমানটা বুঝতে পারছে।

সত্যি, হঠাৎ লাট্টুর নামের হেলাফেলার মেয়েটা যেন ওকে 'তুয়ো' দিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে।

লাট্টু নিজেই ব্যাপারটাকে ধাতস্থ করতে পারছে না। ভবানীপুরের সেই লাট্টু! স্কুল কলেজের মাইনে দেবার দিন, যার ভিতর থেকে কান্না ঠেলে আসতো, মার কাছে চাইতে হবে বলে। মা'ই কোথায় পাচ্ছে? পালা করে এক এক মামা এক এক মাসের মাইনে দিতেন। আর বইপত্র? থাক সে কথা।

রণু বলতো আমাকে একবার বড় হতে দে! দেখিস তোর সব দুঃখু ঘুচিয়ে দেবো!

লাট্টু হেসে ফেলতো, তুমি বড় হয়ে আমার দুঃখু ঘোচাবে? তখনো পড়বো আমি?

সেই লাট্টু।

'উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা' করছে।

ভাবা যায় না। লাট্টু তাই রণুর এতো কটু-কথাতেও ছিটকে চলে যায় না। নেমে আসে ওর সঙ্গে সঙ্গে। বলে, তুমি এমন করছো রণুদা, যেন আমি কালই যাচ্ছি। কবে হয়ে উঠবে কে জানে। এর মধ্যে এসো লক্ষ্মীটি। দুটি পায়ে পড়ি।

রণু দাঁড়াল। ওর দিকে তাকিয়ে দেখল। বললো, এসে কী হবে?

লাট্টু দৃঢ় গলায় বললো, পাঁচ বছর পরে সমাজ সংসারের অবস্থা অনেক বদলে যাবে রণুদা। মাকে সেই কথাই বলে যাবো, কথা আদায় করে নেবো। তুমিও ততদিনে—

আমি ততদিনে কতখানি হতে পারব হে? বিদেশ ঘুরে আসা মহিলার কাছে তো কীটস্য কীট। কসমেটিকসের দামই জুগিয়ে উঠতে পারবো না।

লাট্টু তখন হতাশ ভাবে বললো, আর কত ধিক্কার দেবে রণুদা? তোমায় আমি এরকম ভাবতাম না। ঠিক আছে, আমার জন্যে বসে থাকার দরকার নেই তোমার। বিয়ে টিয়ে করে সুখে ঘর সংসার কোরো।

রণু বললো, এইটাই আসল কথা। নিজের জন্যে লাইন ক্লীয়ার রাখছিস, এই তো? যাক এবার ওপরে উঠে যা। এগিয়ে দেওয়ার পক্ষে সময়টা বড় বেশী নেওয়া হচ্ছে। তোর গার্জেনরা না ভেবে বসে, ছোকরা মেয়েটাকে নিয়ে ভাগলো না তো?

লাট্টু একটু কাছে সরে এলো। বললো, সে সাহস আছে?

পাগল। চাল নেই চুলো নেই, পায়ের তলায় মাটি নেই সাহস অমনি করলেই হলো।

চলে গেল গেট পার হয়ে।

লাট্টু দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর একটা সঙ্কল্পে দৃঢ় হলো। শুধু একটু অভিমানে জীবনটাকে বরবাদ দেবে, এমন বুদ্ধিহীন মেয়ে সে নয়। তা যদি হতো অভিমানে কবেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতো। কাকার বাড়ি চলে আসা, এ যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ পাওয়া।

২১

সূর্যবাণীর সম্পাদক বললো, ফেরত নিতে এসেছিস? তার মানে? সে তো অলরেডি প্রেসে চলে গেছে। কম্পোজ হয়ে গেছে।

এখনো নেওয়া যেতে পারে।

মাথা খারাপ। ওর সঙ্গেই কেতকী সেনের গল্প। তুই যে এতো লাজুক তা জানতাম না। আমি বলছি ও বেশ চলে যাবে। জানিসই তো বাবা, 'ভুগতে ভুগতেই মরে, আর লিখতে লিখতেই সরে।' আয় চা খা।

আজ থাক বলে চলে গেল রণু। নিজের উপর রাগ হচ্ছে। সেইদিনই এলো না কেন। দুদিন রিসার্চ ক্লাস করতেও যায় নি। ভাবছে কী হবে এখনো ওটা নিয়ে টেনে চলা। উঠে পড়ে যাহোক একটা চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে কোথাও চলে যেতে পারলে স্বস্তি হয়।

ভুবনবিজয়ের নাটক সমাপ্তির পথে।

কিন্তু কাউকে একটু না শুনিয়ে স্বস্তি হচ্ছে না।

ইচ্ছে যে প্রতীক্ষাকে শোনান। ওই মেয়েটাই যা বুঝবার। একটা ছেন্দা

ভক্তিও আছে। ছেলেরা তো বাবার এসব শুনে 'পাগলামী' বলে হাসবে, জানাই কথা।

কিন্তু শোনাতে বসলেই তো নীহারকণা এসে জায়গা জুড়ে বসে পড়বেন। আর আলাত পালাত কথা বলে বলে রসভঙ্গ করে ছাড়বেন। প্রতি লাই-নেই জিগ্যেস করে করে জানতে চাইবেন কে কী বৃত্তান্ত, কী হলো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভুবনবিজয়ের কোনো কোনো সময় হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় গিন্নীরা তো দেখি কালীঘাট, গঙ্গারঘাট, ভাইয়ের বাড়ি বোনের বাড়ি বেড়িয়ে বেড়ায়. নীহারকণার কী ছাই কোনো শখই নেই।

রসভঙ্গের আশঙ্কা সত্ত্বেও উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখতে এলেন কে কোথায় কী কাজে ব্যস্ত। কিন্তু ছন্দভঙ্গ করে বসল প্রতীক্ষাই। কোথা থেকে যেন এসেই বিনা ভূমিকায় জিগ্যেস করে বসল, বাবা, বুনো কেন দু তিন দিন আসে নি জানেন?

বুনো!

ভুবনবিজয় আকাশ থেকে পড়লেন।

কোথায় সুভাষচন্দ্র, আর কোথায় বুনো।

থতমতই খেলেন, আসে নি?

না। তিনদিন থেকে দেখছি—

ভুবনবিজয় অসহায় গলায় বলেন, অসুখ বিসুখ করেছে বোধহয়!

প্রতীক্ষা একটু দাঁড়াল।

তারপর যেন মরীয়া হয়েই আবার বলে উঠল, কোনোদিন আমি না থাকতে, এসে ফিরে যায় নি তো?

এসে ফিরে যায় নি তো!

ভুবনবিজয়ের স্মৃতির অতলে যেন একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল। কোনদিন যেন একবার নীহারকণাকে একটানা খুব কিছু বলতে শুনেছিলেন। মনে হয়েছিল, টার্গেটটা বোধহয় বুনো। কিন্তু ঠিক তখন 'নেতাজীর' অন্তর্ধানের পালা। উত্তমচাঁদের মুখে হিন্দী দেবেন না বাংলা দেবেন না কি ভাঙা ইংরিজিই দেবেন, তাই ভাবছিলেন। ঠিক সেই সময় গোলমেলে গোলমাল।

উঠি-উঠি করেও ওঠা হয় নি।

মনে হচ্ছে যেন একটা বাসন আছড়ানোরও শব্দ হয়েছিল। ভুবনবিজয় কর্তার ভূমিকা যথাযথ পালন করতে গলা ভারী করে বলে উঠেছিলেন, কী পড়ল?

নীহারকণা বলেছিলেন, কিছু না।

তবে আর ভাবনার কী আছে?

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভাবনার কিছু ছিল।

ওই ধিক্কার লাঞ্ছনা বোধহয় বুনোর উপরই বর্ষিত হচ্ছিল। উঠি উঠি করতে করতে থেমে যাওয়ায় আর মাথা ঘামান নি ও নিয়ে।

আরো অসহায় গলায় বললেন, তা হয়তো হতে পারে না। কবে যেন তোমার শাশুড়ী কাকে নিয়ে বকবক করছিল, তুমি ছিলে না।

ওঃ। বুঝেছি।

বলে চলে গেল প্রতীক্ষা।

ও বুঝেছি। সেরেছে।

প্রমাদ গোণলেন ভুবনবিজয়।

মেয়েটা একটু অভিমানী আছে। মুখে বেশী কিছু বলে না, কিন্তু মুখের ভাবেই ধরা পড়ে যায় খুব দুঃখ পেয়েছে। আজ আবার ঠিক দুঃখও মনে হলো না।

মুশকিল।

সুভাষচন্দ্র অন্তর্হিত হলেন।

ভুবনবিজয় উঠে পড়ে খালি গায়েই একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বুনো সম্পর্কে ভুবনবিজয়েরও একটু অপরাধবোধ আছে। তুচ্ছ একটু চায়ের জন্য নীহারকণা যে নীচতা করেন, তা সত্যিই লজ্জাজনক। ভুবনবিজয়ের রুচির উপর হাতুড়িই মারে, কিন্তু প্রতিকারের পথও তো খুঁজে পান না।

আযৌবন একটি স্ত্রৈণ পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করে এসেছেন বলেই যে নীহারকণার কাজের প্রতিবাদ করতে ভয় খান, তাও ঠিক নয়। নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখার অভ্যাস না থাকলেও, এটুকু বোঝেন ভুবনবিজয়,

অথবা সব কর্তারাই বোঝেন তাতে হিতে বিপরীত হবে বৈ সুফল কিছু হবে না।

হয়তো হঠাৎ যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলা সেই পোড়া দেশলাই কাঠিটা থেকেই লঙ্কাকাণ্ড ঘটে বসবে।

সদাহাস্যবদনা নীহারকণা যে ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করীও হয়ে উঠতে পারেন, এ অভিজ্ঞতা একদা নবযৌবনেই সঞ্চয় করে ফেলেছেন ভুবনবিজয়।

ভুবনবিজয়ের বাপ তখনো বেঁচে। একবার তাঁরই কোনো শাসনে বারণে বাপের বাড়ি যাওয়ায় বাধা পড়ায় নীহারকণা নামের ফুটফুটে সুন্দর ললিত-লবঙ্গলতা গঠন বৌটি সেই শ্বশুরের কৌটো থেকেই একড্যালা আফিং খেয়ে বসেছিল।

কতটা খেলে কাজ হয়, আর কতটা খেলে শুধু কেলেঙ্কারীই হয়, সে জ্ঞান ছিল না বলেই হোক, অথবা ওই কেলেঙ্কারীটাই প্রার্থিত হোক, সেইটাই হলো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তদবধিই ভুবনবিজয়ের ওই ভূমিকা। একান্ত বশম্বদ, বশ্য বিমোহিত মুগ্ধ ভর্তা।

তা ছাড়াও—

ছেলের বিয়ের পর থেকে আরো সাবধানী হয়ে গেলেন। ছেলেরাও যেমন বিয়ে হলেই বেপরোয়া দুঃসাহস হারিয়ে ফেলে ভীতু ভীতু হয়ে যায়, কথা বলার সময় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে বসে, ওজন করে পরিবেশন করে, কর্তাদের অবস্থাও প্রায় তেমনিই হয়।

চোখের সামনে অন্যায় ঘটে যেতে দেখলেও, ন্যায় অন্যায় কথা বলার সাহস হয় না। অতএব অবোধ সাজাই শ্রেয়ঃ। কালা আর অন্ধ হওয়াই সমীচীন। বোবা পার্টই যখন প্লে করতে হবে, তখন 'কালা অন্ধ' হওয়াটা বরং সভ্যতা।

শাসকের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদ তুললেই কি শাসিতের দুঃখ ঘোচে? বরং বাড়ে।

তবু আজ আচমকা বিবেকের দংশনেই হোক, অথবা হঠাৎ খেয়ালের বশেই হোক, বেরিয়ে পড়লেন, বোধকরি সেই হতভাগা বুনোর সন্ধানেই।

লোকটা যে ঠিক কোথায় থাকে, তা জানা না থাকলেও একটা পানের

দোকানের আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা উঁচু মঞ্চ সদৃশ ওই দোকানটার নিচের খোন্দলটায় গুটি-সুটি মেরে শুয়ে বসে থাকে অনেক সময়।

এখন বেলা প্রায় চারটে, এই তো চা খাবার সময়, সে কি আর এখনো শুয়ে আছে ? অন্য কোনো বাড়িতে হয়তো গেলাস পাততে গেছে।

এসে দেখলেন, পানের দোকানের নিচের সেই জায়গাটায় এক ডাঁই ডাব। তার মানে পানওলা আর একটা ব্যবসা ফেঁদেছে ! তবু এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন তাকে। সে অবহেলায় বললো, কে জানে বাবু কোথায় গেছে। পাগল ছাগলের মতি, গরমের সময় ডাবটা খোঁজে অনেকে, তাই চাট্টি আনিয়ে রাখা। দেখে না, রেগে আগুন। যেন ওব ঘরটা আমি জবর-দখল করেছি। বুঝুন ? গালমন্দ করে চলে গেল।

আব কোথায় খুঁজবেন ?

এক যদি সেই সাইকেলের আড্ডাটায়—

সেইদিকেই এগোচ্ছেন, ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনাটা। স্বয়ং ভগবান এসে ধরা দিলেন।

চায়ের জল ফুটে ফুটে মরে যাচ্ছে, ভুবনবিজয়ের দেখা নেই।···

নীহারকণা বারকয়েক জিগ্যেস করেছেন, এমন সময় তোমার শ্বশুর কোথায় বেরোল গো বৌমা ?

বৌমা মাথা নেড়েছে।

নীহারকণা নিজেই স্বগতোক্তি করেছেন, চায়ের সঙ্গে গরম মুড়ি খাবার শখ হলো বুঝি হঠাৎ ! তা তাতেই বা এতো দেরি কিসের !

কথাটা আকাশ থেকে পড়া নয়, মাঝে মাঝে এমন শখ হয় ভুবনবিজয়ের। ···কাছেই একটা ভুজাওয়ালার দোকানে এই সময় টাটকা মুড়ি ছোলা ভাজে, বাতাসে তার সৌরভও ভেসে আসে। চা খাবার আগে চট করে বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু না বলে যান না কখনই।

বারবার বাইরের দরজায় উঁকি মেরে মেরে, নীহারকণা হাত-পা ছেড়ে বসে পড়ে বলেন, আমার তো ভারী ভাবনা হচ্ছে বৌমা। তুমি একবার

বেরিয়ে দেখলে পারতে। আমার তো আর সে ক্ষমতা নেই। কখন বেরিয়েছে মানুষ।

মনে মনে বলেন, থাকলে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতাম না তোমার মতন।

প্রতীক্ষার মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল। হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়াটা দেখেছে সে।···আস্তে বলে, খুব বেশীক্ষণ তো বেরোন নি মা, মিনিট চল্লিশ হয়েছে—

তুমি বুঝি ঘড়ি দেখেছিলে?

চায়ের জল চাপাবার সময় দেখেছিলাম।

শখ হয়েছিল, ঘরে তুটো চিঁড়েই ভেজে দিতাম—

বলে কপালটা টিপে ধরেছেন মাত্র, দরজার দিক থেকে ভুবনবিজয়ের উৎফুল্ল স্বর ভেসে এলো—বৌমা। এই যে তোমার পুষ্যিপুত্তুরটিকে ধরে আনলাম।···

তুটি মহিলাই সচকিতে উঠে পড়েছেন।

ভুবনবিজয় সেই বিজয় গৌরবের স্বরেই বলতে বলতে ঢুকে আসেন, যাচ্ছি একটু মুড়ি আনতে, দেখি সামনে—মূর্তিমান! (এটা অবশ্য গোঁজামিলের ব্যাপার! মুড়ির দোকান তার বিপরীতে)···হেঁকে বলি, কীরে বেটা, যাচ্ছিস না কেন ক'দিন? দেখি না আর। চল।···বাবুকে আবার সাধতে হলো কত।

ভুবনবিজয় হাতে বড় একঠোঙা মুড়ি আর তার উপর চাপানো একটা ঠোঙায় 'তেলেভাজা'।

ভুবনবিজয়ের পিছনে বুনো।

তার মুখেও বিজয়গৌরবের দীপ্তি।

প্রকৃত ঘটনাটি বুঝতে প্রতীক্ষার বাকি থাকে না। কিন্তু নীহারকণারই কি থাকে? বিশেষ করে যখন ভুবনবিজয় বলে ওঠেন, দাও বুনোকে চারটি বেশী করে মুড়ি দাও, একটু বেশীই কেনা হয়ে গেছে। গরম ভাজছিল লোভ লেগে গেল।···আবার সামনেই তেলেভাজা।···ঝালঝাল আলুর চপ আছে, খাক ব্যাটা খানকতক।···

মুড়ির দোকানের গায়েই যে তেলেভাজার দোকানটি নয় সেকথা নীহার-

কণা না জানলেও প্রতীক্ষার অবিদিত নয়।

কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে প্রতীক্ষার।

মুড়ি বেগুনী গরম আগুন।

কিন্তু পরিস্থিতিটা যেন মিয়োনো মিয়োনো। দেরির জন্যে নীহারকণা তেড়ে এলেন না এটা অস্বস্তিকর।···প্রতীক্ষা যথাকর্তব্য করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু চুপচাপ।···শ্বশুর শাশুড়ীকে বাটি করে মুড়ি মেখে দিলো, প্লেটে করে বেগুনী আলুর চপ। নীহারকণার গাছ থেকে তুটো কাঁচালঙ্কা ছিঁড়েএনে দিলো। তারপর একখানা খবরের কাগজে ওই তুটো জিনিস সত্যিই যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে বসল।

অগত্যা আবারও ভুবনবিজয়।

কই রে তোর গেলাস কই ?

বুনো বোধ করি এইটির অপেক্ষাতেই ছিল। বলে উঠল, বুনো কি রাত-দিন গেলাস হাতে নিয়ে বেড়ায় ? আপনি পথ থেকে ধরে আনলে—আর গেলাস তো সিদিনকে ফেলে দেচি।

ফেলে দিয়েছিস ? সেকি রে।

বুনো একথাবা মুড়ি মুখে পুরে বলে, তা কি করব !···এককৌট্টা চায়ের লেগে নিত্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান। ··বলি ধুত্তোর নিকুচি করেচে নেশায়। গেলাস আছড়ে ফেলে নেশার মুকে মারলাম ঝাড়ু। তদবধি চা বন্ধ।

এখন প্রতীক্ষা একটু হাসল।

বোধহয় শ্বশুরের প্রতি করুণাপরবশ হয়েই। একটা তোবড়ানো অ্যালু-মিনিয়ামের গ্লাসে এক গ্লাস চা ঢেলে আঁচলে চেপে ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে একটু হেসে বললো, বেশ করেছ। এবার বন্ধটা খোলো।

মুণ্ডুটা হঠাৎ হেঁট করে মাটিতে ঠুকে বুনো বলে ওঠে, সাদে বলি আমার জগজ্জন্নী মা। সন্তানের প্রিতি কতো 'ছে:হ'। বচরের মধ্যে সাত ব্যাটার মা হও গো মা !···ধনে পুত্তুরে নক্কীলাভ হোক।

সন্তুষ্ট মুখে গেলাসটা তুলে নেয়।

আর এতোক্ষণে এতক্ষণকার নীরবতা ভঙ্গ করে নীহারকণা তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে ওঠেন, কেন ? এমন একখানি সোনারচাঁদ ব্যাটা থাকতে আবার

ব্যাটার কী দরকার ? তোমাকেই পুষুক বসে বসে !

বুনো মুখ থেকে গেলাস নামিয়ে কিছু বলতে উদ্যত হচ্ছিল, ভুবনবিজয় চটপট প্রায় বেখাপ্পাভাবে উচ্চ রোলে হেসে উঠে বলেন, সোনার চাঁদ ! হা-হা-হা ! শোন, বেটা শোন, তোর 'জগজ্জননী' মায়ের জননীর কথাখানা শোন। 'সোনারচাঁদ !'···হা-হা-হা।

২২

সমর যে সহসা এমন বিপদে পড়ে যাবে, সে-কথা কোনো সময় ভাবে নি। কিন্তু 'বিপদ' না সম্পদ ? তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

আবার তার বন্ধু অবনীশও বুঝে উঠতে পারছে না—বিনা চেষ্টায় বিনা আয়াসে লক্ষ্মীর ঝাঁপি হাতে পেয়ে গিয়েও মানুষ সেটা তুলে নিতে দ্বিধা করে কী করে ? কোন্ বুদ্ধি, অথবা দুর্বুদ্ধিতে ?

'তুই তোকারি'র বন্ধু নয়, 'আপনি আজ্ঞের'ই স্টেজ্, কিন্তু মনে মনে বলতে বাধা কোথায় ? তাই মনে মনেই আওড়ালো সে, বুঝলাম তোর বাড়ির প্ল্যান তৈরি হয়ে গেছে, বুঝলাম 'বাড়ি বাড়ি' করে ব্যস্তও হয়েছিস, তুই অথবা তোর পরিবার বুঝলাম শীগ্‌গিরই আরম্ভ করবি বলে প্রস্তুত হচ্ছিস। তবু বলি কন্যাদায় তো নয় ? রাস্তাতেও পড়ে নেই, দিব্যি বাপের দালানের নিচে আছিস। দু'দশ দিন পরেই না হয় করবি। শুধু শুধু এতো-বড় দাওটা ছাড়ে মানুষ ? এতে তো তোর বরং কাজ এগিয়েই যাবে। মুফতে অতোগুলো টাকা পেয়ে যাবি।

তা মুফতেই বলা যায়।

চার কাঠা জমি কিনে রেখেছে সমর চার হাজার টাকা করে কাঠায়, সেই জমির এখন চড়চড়িয়ে দর উঠছে। একজন দশ হাজার পর্যন্ত দিতে চাইছে। তেমন চাপ পেলে এগারো বারোতেও রাজি হয়ে যাবে।···তা হলেই বোঝো ? ওই টাকাটায় তো তোর অন্যত্র জমি কিনেও বাড়ির একতলা উঠে যাবে।

এইটা তুই ছাড়তে চাইছিস ? টালবাহানা করছিস ? বুদ্ধু ! মুখ্যু !

কিন্তু মুখে তো আর এমন প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করা যায় না ? তাই বন্ধু মুখে বলেন, নাঃ ! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছি না। জমির অভাব কি ? ঠিক এই অঞ্চলে না হোক্ কালই আমি আপনাকে অন্য জমির সন্ধান দিতে পারি।·· হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না।···এটা ভদ্রলোক ঝোঁকের মাথায় এতোটা দর তুলেছেন, না হলে, আর কেউ এতোটা দিতে চাইবে ?

ব্যাপারটা যে ঝোঁকের সেটা সত্যি। কিছুদিন হলো পাশেই সে ভদ্রলোক একখানি মনোরম বাড়ি বানিয়ে নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন, (যাঁকে দেখলেই নাকি সমরের ঠিক ওই রকমটি হয়ে পড়বার ইচ্ছের প্রাণ ছট-ফটিয়ে ওঠে।) তিনি এই পাশের জমিটি তাঁর ভায়রাভায়ের জন্যে সংগ্রহ করতে সচেষ্ট।···ভায়রাভাই ! তার মানেই দু'বাড়ির গৃহিণী দুই বোন। এর থেকে আদর্শ পড়শী আর কী হতে পারে ?

অবনীশ বললো, আমি যদি আপনার অবস্থায় পড়তাম সমরবাবু, ডিসি-শান নিতে এক মিনিটও দেরি করতাম না।···তবে এখন যদি না ছাড়েন, পরে পস্তাতে হবে তাও বলে রাখছি। ইচ্ছেপূরণ না হওয়ার দরুন লোকটা নিশ্চয় আপনার ওপর খাপ্পা থাকবে। তার মানে একেবারে গায়ের কাছে শত্রু !···চিরদিনের মতন। বুঝুন 'সুবিধেটা' !

কে জানে অবনীশ ওপক্ষের কাছে কতটা দালালি খেয়েছে।

তবে শেষের কথাটায় সমর একটু বিচলিত হলো।···সত্যি ওই অ্যারিস্টো-ক্র্যাট প্যাটার্নের লোকটা যদি আক্রোশপরায়ণ হয়, ব্যাপারটা খুব সুবি-ধের হবে না।

তা ছাড়া টাকার অঙ্কটাও—

মরুকগে, ছেড়েই দিই। একটা নিশ্চিন্ততা-প্রতীক্ষা শুধু জানে জমি কেনা আছে, বাড়ি হচ্ছে, কোথায় কী বৃত্তান্ত জানে না। দেখেও যায় নি।··· অতএব—

অতএব তৈরি প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল।

চার কাঠা জমি বাবদ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা ঘরে তুললো সমরবিজয় চৌধুরী।

…অবশ্য দলিলে কিছু কারচুপি করতে হলো। সে তো করতেই হয়।… কিছু সাদা কিছু কালো না করলে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই নানা ঝামেলা। …সে যাক। এটা প্রতীক্ষার কাছে ভাঙল না সমর।…দ্রুত চেষ্টা চালাতে লাগল শূন্যস্থান পূর্ণ করতে।…

নিজের ব্যবসা তো ওই।

তবে ঠিক মনের মতোটি হওয়া শক্ত বৈকি। বড় ভালো ছিল জমিটা। দক্ষিণে রাস্তা, পূর্বেও রাস্তা বেরোচ্ছিল মাঠ কেটে। কর্ণার প্লট হয়ে যাচ্ছিল। যাক্ কী আর করা। টাকার কাছে কিছুই বড় নয়।

২৩

'সূর্যবাণী' অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল রণু, মুখখানা বিরক্ত। রণুর এমন বিরক্তি রেখাঙ্কিত মুখ কে কবে দেখেছে ? আজ দেখা যাচ্ছে— শশাঙ্ক হেসে হেসে বলেছে, তোর বায়নাটা যেন সেই রূপকথার রাজাদের মতো হচ্ছে রণবিজয়!…আজ হুকুম হলো রাণীকে কেটে রক্তদর্শন করাও, পরদিনই অর্ডার গেল সেই রাণীকে এনে দাও।…তোর কবিতা ছেপে বেরোবার মুখে, এখন এসেছিস ফেরত নিতে। আরে বাবা আমি বলছি ভালো হয়েছে। তুই যে ভেতরে ভেতরে এমন 'লজ্জাশীলা' তা জানতাম না।…

অতএব রাজ্যের বিরক্তি মুখে মেখে ফিরছে।

সেইদিনই আসা উচিত ছিল তার।

জীবনের অনেক কিছু ভুলই সংশোধন হয়ে ওঠে না সামান্য গাফিলতিতে।…

ছোট রাস্তাটা থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিয়েছে, সামনে লাট্টু।…

মুহূর্ত খানেক স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল লাট্টু।

তারপর শক্ত গলায় বললো, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। এসো আমার সঙ্গে। কথা আছে।…

যাবোটা কোথায় ?

অতো কথায় দরকার কি ? কিছু না বলে আমার সঙ্গে যেতে পার না ?

বিশ্বাস নেই ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের বাইরে।

বলে ওর সঙ্গে সঙ্গেই চলল রণু।

আজ আর একবার মনে হলো রণুর, লাট্টুর কথার ধরন খুব পাল্‌টে গেছে।

রণুদা, তোমার মনে আছে একদিন আমরা দল বেঁধে এই পাড়ায় সিনেমা দেখতে এসেছিলাম। আর কোন্ একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সবাই চা খেয়েছিলাম।

মনে রাখবার কথা মনে ছিল না। বললি বলে মনে পড়ল।

মনে রাখবার কথা মনে ছিল না ?

'দল বেঁধে' বেড়ানোর ব্যাপার মনে রাখার কী দায় ?

আমার কিন্তু এপাড়ায় ঢুকেই মনে পড়ে গেল। ভাবছি কোথায় সেই রেস্টুরেন্টটা। এসেছিলাম তো আমরা 'এলিট'-এ তাই না ?

হবে হয়তো। কিন্তু আমার খোঁজেই যাচ্ছিলি যদি তো 'লীলাধামে'র পথে না গিয়ে এদিকে কেন ?

আর বোলো না। এখানে কোন্ সুটকেসের দোকানে কাকা কি সব কিনে কিনে রেখে গেছে, আমার ওপর অর্ডার একবার দেখে নিতে। তাই ওগুলো উদ্ধার করে গাড়ি ফেরত দিয়ে পরে যেতাম।

এতোক্ষণে দেখা গেল অদূরে একটা জায়গায় কাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে। শোফার দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে।

তোর কথাটা কিন্তু ঝাপসা রয়ে গেল। এখান থেকেই তো কাজ মিটে যেত। ওদিকে কী কাজ পায়ে হেঁটে ?

পায়ে হাঁটা শব্দটার ওপর জোর দিলো রণু।

লাট্টু কি বুঝল না ?

তবু লাট্টু গায়ে মাখল না। বললো, শুনলাম 'লীলাধামে' নাকি আজকাল তোমার টিকি দেখা যায় না, নেহাত রাতে ছাড়া। কোথায় কোথায় ঘোরো।

কোনখান থেকে খবর সাপ্লাই হচ্ছে ?

অবিশ্বাস্য জায়গা থেকে নয়। সমরদার সঙ্গে দেখা হলো সেদিন পুরনো পাড়ার ওখানে—

পুরনো পাড়ায় যাস এখনো ?

বাঃ। যাই না ? এখন তো আবার মায়ের কাজ বেড়েছে, আমাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দেখা করা।

তাই বুঝি ?

হুঁ ! নাহলে নাকি সবাই ছিছি করবে। বলবে বলা নেই কওয়া নেই মেয়েটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলে ? কেউ জানল না ব্যাপারটা কী !··· ওখানেই আবার তোমার একটু সন্ধান পেলাম। তপনদা বললো, এই পাড়ায় আসো যাও তুমি—

রণু বললো, বেশ দেখা তো হলো। এখন গাড়িতে গিয়ে ওঠো।

আশ্চর্য রণুদা ! দেখাচ্ছ বটে !

লাট্টু এগিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে শোফারকে কী নির্দেশ দিলো।···লাট্টু চলে এলো। বললো, এসো এখন একটা রেস্টুরেন্ট খুঁজে বার করো। কথা আছে।

ওর ওই অনায়াস নির্দেশ দেওয়াটা দেখল রণু।

রণুর মনে হলো বড়মানুষী ভঙ্গিটা বেশ শিখে ফেলেছে লাট্টু।

রণু বললো, টাঁক গড়ের মাঠ।

লাট্টু বললো, ওকথা শুনতে চাই না, আজ আমি তোমার পকেট ভেঙে খাবই।···

তোর তো এখন অনেক টাকা। তুই খাওয়া না বাবা।

না।

বসার পর লাট্টু প্রথমেই বলে উঠল, মাকে জিগ্যেস করেছিলাম রণুদা ! মা বলেছে কোনো বাধা নেই।

রণু অবাক্ হয়ে বললো, কিসের ?

বাঃ চমৎকার ! এতোদিন তুমিই আমায় জপিয়েছ রণুদা ! জপিয়ে জপিয়ে সেদিন ট্রেনে করে সেই আদি গোবিন্দপুরে গিয়ে, কী করলে সারাদিন মনে নেই ? এখন স্রেফ্ অবাক্।

ওঃ ওই কথা বলছিস ? এমন আচমকা বললি—

মাও তাই বলেছিল সেদিন। 'এমন আচমকা বললি—'তারপর মা বললো, 'সম্পর্কে এমন কিছু বাধে না। একসঙ্গে মানুষ হয়েছিস তাই'— মার অমত নেই।

রণু বললো, এখন আর ওসব কথা উঠছে কেন ?

বাঃ! এখনই তো উঠবে। একটা ব্যবস্থা পাকা না করে সেই কোথায় কোন্ দূরে চলে যাব ?

রণু টোস্টে কামড় দিতে দিতে বললো, এখন এই ছেলেখেলা ছেলেখেলার 'পাকা' ব্যবস্থার মূল্য কী ?

ছেলেখেলা মানে ?

মানে 'ছেলেখেলা !' পাঁচ বছরের জন্যে উড়তে যাচ্ছ তুমি। নতুন দেশ নতুন পরিবেশ, নতুন জীবন।···হয়তো একখানা 'আমেরিকান' মস্তানেরই প্রেমে পড়ে বসলে! তখন এই প্রমিসের মূল্য থাকবে ?···

লাট্টু চোখ তুলে বললো, নিজের ওপর বিশ্বাস নেই ?

রণু উদাস গলায় বললো, ভবিষ্যতের কথা কিছু বলা যায় ? ধর আমিই বদলে গেলাম। আর কারুর প্রেমে পড়ে গেলাম—

হঠাৎ একগোছা দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠার মতো ফস্ করে জ্বলে উঠল লাট্টু। সেই ছেলেবেলার ঝগড়ার গলায় বলে উঠল, ঈস্ ! তা আর নয় ? পড়াচ্ছি অন্য কারো প্রেমে। আহ্লাদ !···তিল তিল করে জপিয়ে জপিয়ে আমার মুণ্ডুটি খেয়ে এখন উনি বদলে যাবেন। আর কারুর প্রেমে পড়ে বসবেন ! ছাড়ো ওসব কথা। আমার সব স্পষ্ট কথা—

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

রণু একটু হেসে বলে, এই ক'দিনের মধ্যেই অনেক উন্নতি হয়েছে তোর ! অনেক পষ্ট কথা বলতে শিখেছিস !···

রণুর হাসিতে বিদ্রূপের জ্বালা।

লাট্টু গম্ভীর ভাবে বলে, জীবনমরণের সমস্যা এলে উন্নতি হয়েই যায় রণুদা।···তোমাকে এতো বললাম সেদিন, আবার ওখানে আসতে। আর এলে না। কচি খোকার মতন মান দেখিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে শুরু

করেছো।···মানে আছে এর ?···ভাবনা ধরে গেল। আমি অতোদিনের জন্যে চলে যাবো। আর তুমি ইতিমধ্যে 'দেবদাস' হয়ে বসে থাকবে, কেমন? ওসব নাটক ছাড়ো।

তোর অভাবে আমি একেবারে 'দেবদাস' বনে বসে থাকবো ? নিজের সম্বন্ধে খুব অহঙ্কার দেখছি !

নিজের সম্পর্কে অহঙ্কার নয় রণুদা, তোমার সম্পর্কে ভয়।···দেখলাম তো নিজেকে কণ্ট্রোল করবার ক্ষমতা তোমার কত কম।···অথচ আগে ভাবতাম—নাঃ, যা ভাবতাম তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে না নামলে তো বীরপুরুষ কাপুরুষ বোঝা যায় না। যেদিন তুমি মা, কাকা, ওদের সামনে ঠিক হিংসুটের মতো ব্যবহার করলে!···লাট্টু বেচারা কোন্ অবস্থায় পড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, ভেবে দেখো সেটা ? তা না বাবু রাগ দেখিয়ে, গাল ফুলিয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

রণু উদাস গলায় বললো, আর কী করবার ছিল রণু চৌধুরীর ?

পুরুষ মানুষের মতো ব্যবহার করবার ছিল।···লাট্টু বললো, আর আমি কিনা কত দিন রাত বসে বসে স্বপ্ন দেখেছি, রণুদাও একটা কোনো স্কলারশিপ যোগাড় করে ফেলেছে, রণুদাও বেশ যাচ্ছে।···মা বলছে। 'নিশ্চিন্দি হচ্ছি বাবা। তবু রণুও যাচ্ছে।'···তখন মনে মনে হাসছি। তবু তো আসল কথা জানো না মা। জানলে আরো নিশ্চিন্দি হতে। তখন তো মাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করি নি 'আমাদের বিয়ের ব্যাপারে সম্পর্কে বাধে কিনা।'···মনে ভেবেছি পাঁচ সাত বছরে সমাজের কুসংস্কার অনেক কমে যাবে।···তোমার 'নন্ কো-অপারেশন' দেখে বাধ্য হয়েই ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে নিতে হলো।

বলতে বলতে লাট্টু ওর বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে রণুর ডান কাঁধটা ছুঁয়ে ব্যগ্র গলায় বলে উঠল, আচ্ছা রণুদা, এখনো চেষ্টা করা যায় না? আমার স্বপ্নটা সত্যি হয় না ?···

'স্বপ্ন' কথাটার মানেই হচ্ছে, যা 'অলীক' 'অবাস্তব' সত্যি হয় না।

থাক, ওসব আমার জানা আছে।

লাট্টু বললো, দেখলাম, তোমার কাছে সাহায্যের আশা নেই। কিন্তু আমি

তো আর রাগ দেখিয়ে গাল ফুলিয়ে সরে গিয়ে জীবনটাকে লোকসানের খাতায় বসাতে পারি না। মেয়েদের অসাধ্য কাজই করলাম।···নিজের বিয়ের কথা নিজে পাড়লাম।···অথচ তুমিই রোজ বলতে—'আচ্ছা—বিবো-পিসিকে জিগ্যেস করছি—'

তখন তুমি বাধা দিয়েছ।

বাধা দিয়েছি অনেক কারণেই রণুদা। মার কি তখন পায়ের তলায় মাটি ছিল ? ভেবে দেখ, ভবানীপুরের বাড়িতে একথা উঠলে কী কাণ্ড হতো ? ···সে যাক। এখন অবস্থা আয়ত্তে এনে ফেলেছি। কাকা বলছে, 'ঠিক আছে। রেজিস্ট্রিটা তাহলে সেরে রেখে যাও। 'সেরিমনিটা' এসে হবে। তোমারও তো রিসার্চ শেষ হতে এখনো দেরি রয়েছে।'

রণু কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, সেলাম মেমসাহেব।·· কাকাকেও স্টেজে এনে ফেলেছ ?

বাঃ ! কাকাকে না বললে হবে ? তা ছাড়া উনি তো আর অতো সম্পর্কের চুলচেরা বিচারের ধার ধারেন না। মা তোমার নিজের পিসি হলেও, কিছু এসে যেত না ওঁর।···

রণু বললো, রেজিস্ট্রি করে রেখে যেতে হবে, এটা অর্থহীন।···কথা দেওয়াই যদি যথেষ্ট না হয়, ওতেও হবে না।

লাটু বললো, আমিও ঠিক এই কথাই বলেছিলাম রণুদা।···কাকা তখন আমায় সংসার সম্পর্কে অনেক জ্ঞান দিলো।·· মানুষের জীবন মরণের কথা না কি বলা যায় না, মা যদি ইতিমধ্যে ধরাধাম ত্যাগ করে, তাহলে মরেও শান্তি পাবে না। তাছাড়া কাকাও সর্বদা চিন্তায় থাকবে কী হয় কী হয়। যদি নিজের চেষ্টায় নিজের পছন্দসই পাত্র যোগাড় করে জামাই করতে পেতো, সে আলাদা কথা। সেটা আমি ফিরে এলে পরে হতে পারতো। কিন্তু ভাইঝি যখন নিজেই সে ভারটা নিয়ে বসে আছে। তখন কাজটা সমাধা করে ফেলাই ভালো। কে বলতে পারে ইতিমধ্যে কাকী জুয়া খেলে সব উড়িয়ে ফেলে কাকাকে নিঃস্ব করে বসে কিনা। অতএব কাকা এই-বেলাই যৌতুক টৌতুক যা দেবার দিয়ে নেবে।···মানুষটা সত্যিই উদার রণুদা। ভীষণ একখানা পাত্রটাত্র সংগ্রহ করবার খুব একটা বাসনা ছিল,

কিন্তু শুনে এক কথায় বললো, তুই যখন ঠিক করে ফেলেছিস, তখন তো আর কোনো কথাই ওঠে না।

হুঁ।···

রণু বললো, তবে বিবোপিসি বোধহয় শুনে প্রথমটা ক্ষেপে উঠল ?

লাট্টু মধুর মোলায়েম একটু হাসল।

মোটেই না। মার মধ্যেও এই বাসনার অঙ্কুর ছিল। শুধু লোকভয়ে— যাক কবে আসছ রণুদা ? মার সঙ্গে কাকার সঙ্গে দেখা করতে ?

রণু এখন একটু গম্ভীর হয়। বলে, নিজেকে এভাবে বেঁধে রাখাটা কি ঠিক লাট্টু ? এতে হয়তো অনেক অসুবিধে দেখা দেবে।

ধ্যেৎ! কাকা বললো, একটা মস্ত সুবিধে—নামের আগে 'মিসেস' থাকলে পৃথিবীতে চরে বেড়ানোর অনেক নিশ্চিন্ততা।

বলেই একটু চুপ করে গেল লাট্টু।

তারপর রণুর চোখে চোখ রেখে গভীর গলায় বললো, রণুদা।

রণু আস্তে বললো, কী হলো ?

বলছি, ছেড়ে চলে যেতে খুব কষ্ট হলেও, একদিক থেকে এ হয়তো ভালোই হলো।

রণু উদাস গলায় বললো, কোন দিক থেকে ?

নিজেকে নিয়ে এলোমেলো করবার, স্বাধীনতা থাকবে না কারুরই। তোমারও না আমারও না। তোমার মনে থাকবে 'আমিটা' আমার নিজের নয়, অন্যের জিনিস।

তার মানে আমার অন্তত 'দেবদাস' হবার উপায় থাকবে না এই তো ?

রণু একটু স্বাভাবিক ভাবে হাসল।

তারপর বললো, এই, বয়টা কয়েকবার ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে, চল্ পালাই এবার।

রাস্তায় বেরিয়ে লাট্টু বললো, চলো রণুদা তোমার সঙ্গেই 'লীলাধামে' যাওয়া যাক।···

কেন ? আমার সঙ্গে তো দেখা হয়েই গেল।

সেজ মামা মামীকে প্রণাম করে আসি।

রণু বললে, যুগলে ? সিনেমার নায়ক-নায়িকার মতো ?

রণুদা, যা দেখছি, তুমি আর কোনোদিন আমায় মন্নিষ্যি বলে গণ্য করবে না। কে বলেছে 'যুগলে' ? আমার তো এখন বিজয়া দশমীর মতো বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রণাম করে আসা একটা ডিউটি হয়েছে।

বিদায় প্রার্থনা ?

তাই।

মা শুনলে মূর্ছা যাবে।

অনেকেই যাচ্ছেন। মেজমামী তো প্রায় স্ট্যাচু বনে গেল। শুধু মেজমামা বললো, অবাক্ হবার কী আছে ? চিরকালই তো জানি লাট্টু একটা কিছু হবে।·· মেজমামা আবার হাত-টাত দেখে তো। আগে অবশ্য বলে নি কিছু। বাড়িই যাচ্ছ তাহলে ?

রণু বললো, নাঃ। আজ থাক। বরং তোর সঙ্গে বিবোপিসির কাছেই যাই।

রণুদা।

লাট্টুর চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে আবেগ উৎসাহ উত্তেজনা, আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

বুনো আবার তার হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছিল, এবং মহাসমারোহেই সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভোগরাগও ভালোই চলছিল। কারণ কেন কে জানে, 'বুনো' সম্পর্কে ভুবনবিজয়ও হঠাৎ বেশ স্নেহশীল হয়ে উঠেছিলেন। অথবা 'সম্ভ্রমসম্পন্ন'। হয়তো পানের দোকানের সেই ঘটনা থেকে এবং এ বাড়ির কোনো 'ঘটনা'র সন্দেহ থেকে বুনোর আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল, তাই সে মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে সম্পর্কে অবহিত থাকতে সচেষ্ট ছিলেন।···

বুনোকে দেখলেই বলে উঠতেন, এই যে এসে গেছেন আমার নাতি সাহেব।··· অথবা বৌমা, তোমার পুষ্যিপুত্তুর আ গিয়া।···

খেতে দেবার সময় গৃহকর্তার সুনজরের ফলে আর শুধু বাসিরুটি বা শুকনো পাঁউরুটিতেই সীমাবদ্ধ রাখা হচ্ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগার ভাগ্য ! সুখ সইল

না। নিজের দোষেই সুখ খোয়ালো বুনো।
এ বাড়ির অধিকার তার গেল।
বুনো যে শুধুই এ বাড়ির একটা ক্ষতি ঘটালো তা নয়, একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তিতে সকলের সহানুভূতি হারালো।
ক্ষতিটাও তো সোজা নয়।
প্রতীক্ষা তো তার ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে দিয়েই তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে গিয়েছিল। কর্তা গিন্নীও মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন তখন। তুই হতভাগা কিনা বাড়িতে গরু ঢুকিয়ে ফুলগাছগুলো ধ্বংস করালি!
'করালি' ছাড়া আর কী?
গরু ঢোকালিই বা না বলা হবে কেন?
চলে যাবার সময় পাশদরজাটা হাট করে রেখে চলে গেলি, একবার ভাবলি না দরজার সামনেই ফুলগাছেরা। ওই দরজা খুলে বেরোবার বা কী দরকার ছিল তোর?
সামনের দরজা দিয়েই তো আসিস যাস।
তা নয়, ওই পাশের রাস্তায় উনি খাওয়া পাতা ফেলতে গেলেন। গিয়েছিল, তা নীহারকণা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু দরজা বন্ধ করেছে কিনা তা তো আর দাওয়া থেকে নেমে উঁকি দিয়ে দেখতে যান নি।
আহা কখন কোন্ ফাঁকে গরু ঢুকে সব গাছ মুড়িয়ে শেষ করে গেছে। নীহারকণা যখন টের পেয়ে হ্যাট হ্যাট করলেন, তখন তো যা হবার হয়েই গেছে। আশ্চর্য একটা গরুর কত বড় পেট। অতগুলো গাছের ডগা তো বটেই গোড়া পর্যন্ত খেয়ে মেরে দিয়েছে।
মরতে সেদিন ভুবনবিজয়েরও বাজার যাবার শখ চেগেছিল। তিনি থাকলে এতোটা হতো না। নীহারকণা পুজো-সেরে উঠে তবে তো দেখেছেন?

বাজার থেকে ফিরে দৃশ্যের ভয়াবহতার মুখোমুখি হলেন ভুবনবিজয়। নীহারকণা কাঁদছেন কপাল চাপড়াচ্ছেন আর সরবে হায় হায় করছেন, আহা আমার গোপাল দুটো টাটকা ফুল পেয়ে বাঁচছিলেন গো। হতভাগা মুখপোড়া এই সর্বনাশটি ঘটিয়ে গোপালের ফুল পাওয়া বন্ধ করলো। বৌ-

মার আমার কত সাধের বাগান, এসে এদৃশ্য দেখে বুক ফেটে যাবে যে গো তার।

বলছিলেন আরো কত কিছু।

রণুর অবদানের কথাও।

দাওয়ার ওপর রণু আর সমর নিস্পন্দ নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভুবনবিজয় ঢুকে পড়েই বললেন, কী ব্যাপার?

তারপর নিজের চক্ষেই দেখতে পেলেন। আর শুনতেও পেলেন এই দুর্ঘটনার নায়ক কে!

নায়ক তো নিশ্চয়ই। দরজা খোলা না পেলে ঢুকতে পারতো হতভাগা গরু?

তবু এটাই তো সব নয়। ভুল মানুষের হয়েই থাকে। বিকেলে আবার চা খেতে এসে দাঁড়াল, এবং তার ওপর গালিবর্ষণ হতে থাকলো, তখন কান মুলে ঘাট মান? প্রতিজ্ঞা কর, আর কক্ষনো এমন কাজ হবে না।

তা নয় বললি কিনা মিচে কতা। এ সমস্তই ওই বুড়ার বানানো কতা। কক্ষনো আমি দুয়োর খুলে রেখে যাই নি। ওই দুয়োর দিয়ে যাই-ই নাই। ডাহা মিচে কতা।

এতে কার না রাগ হয়?

বাড়ির খোদ গিন্নী তো বটে নীহারকণা?

এতো অপমান? সহ্য করবেন তিনি? ধৈর্যচ্যুত হয়েই বলে উঠেছিলেন, বসে বসে মন দিয়ে শুনচো ওর কথা? ঘাড় ধরে বার করে দিচ্ছো না? গলায় দড়ি। আমার গলায় দড়ি!

তখন কিনা ভুবনবিজয় পুরুষোচিত বিক্রমে কর্তব্য-কর্মে এগিয়ে যাবার আগেই বুনো কিনা বলে উঠল, আর ঘাড় ধরতে হবে না। বুনো এমনিই যাচ্চে। য্যাতোদিন ওই মিচে কতার ঝুড়ি কুচুটে বুড়া এ সোংসারে থাকবে ত্যাতোদিন বুনো আর এবাড়ির চৌকাট ডিঙেচ্চে না।

কী বললি! কী বললি!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতেই তেড়ে আসছিলেন নীহারকণা, ততক্ষণে

প্রতীক্ষা এগিয়ে এসে দৃঢ় গলায় নির্দেশ দেয়, বুনো ! যাও, এক্ষুনি চলে যাও। আর কখনো এসো না।

তুমিও ?

বুনোর চোখে আগুন।

বুনোর চোখে জল।

বুনো বলে উঠল, 'আসব না'। সে দিব্যি তো গাললাম ! আবারও গলা-ধাক্কা ? তুমিও ওই হিঁসকুটে কিপটে বুড়ীকে চিনতে নারলে ?···গরু ঢুকে গাচ মুড়িয়েচে ? গরু গোড়া অবদি ওপাড়ায় ? গরু মুড়নো ডাল পাঁচিল টপকে ফেলে ? বুনোকে বিদেয় করার জন্যে—

হঠাৎ কথা থামিয়ে পাগুলে গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল বুনো।

কিন্তু সেদিকে তখন কে তাকায়? কে তাকায় পাঁচিলের মাথায় ? নীহারকণা যে তখন দাঁতে দাঁত লাগিয়ে 'ফিট' হয়ে ধুলোর ওপর পড়ে গেছেন।

একদা এ রোগ ছিল নীহারকণার। অনেকদিন আগে। যৌবনকালের পর সেরে যাওয়া এই রোগটা হঠাৎ আবার আত্মপ্রকাশ করায় দিশেহারা হয়ে পড়েন বৈকি ভুবনবিজয়।···ছেলেরা পর্যন্ত বাড়ি নেই। জোরে জোরে বাতাস করাটা বন্ধ করে দিয়ে প্রতীক্ষা ডাক্তারবাড়িই বা যায় কী করে ? এই অঘটন বুনোর জন্যে।

অতএব বুনো গেল তো গেলই।

ফিরে আসার কোনো পথ খোলা রেখে গেল না।

অনেক রাত্রে প্রতীক্ষা শান্ত গলায় বললো, বাড়ির কী হলো ?

সমর চমকে উঠল। সমরের সম্পদটা গোলায় উঠেছে। কিন্তু বিপদটা সামনে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তবু সমর ম্যানেজ করে নিল। বললো হয়েছে কি জানো, প্ল্যানটায় কী ভুল বেরিয়েছে, কর্পোরেশন ফ্যাকড়া তুলেছে —একটু দেরি হবে।

একতলায় একখানা চালাঘর তুলে নিয়ে বাস্ করা যায় না ?

যায়। যাবে না কেন ? হয়তো তাই করতে হবে, কিন্তু এই ফ্যাকড়টা না

মিটলে তো জমিতে হাত পড়ানো যাচ্ছে না।
অতএব প্রতীক্ষাকে প্রতীক্ষা করতে হবে।
কে বলতে পারে কতদিন ? কত দিন মাস বছর।
'দ্বিতীয় জমি' তো সমরের এখন গোকুলে বাড়ছে।
একেবারে চুপ হয়ে যাওয়া প্রতীক্ষাকে শব্দলোকে নিয়ে আসতে সমর আবার বলে, অর্ডারটা বেরিয়ে গেলে আর একদিনও দেরি করব না। সত্যি বেশী বড় বাড়িতে আমাদের দরকারই বা কী ? একটা ছুটোর বেশী বাচ্চা তো আর কেউ আনেও না আজকাল। ছোট্ট একটু বাড়ি করে নিয়ে বাকি সবটা তোমার জন্যে ছেড়ে দেবো। অনেক বড় বাগান হবে তোমার।
প্রতীক্ষা আস্তে বলে, আমি কোনোদিন অনেক বড় বাগানের স্বপ্ন দেখি নি। আমি এইখানেই একটু ফুল ফোটাতে চেয়েছিলাম। আমার চাওয়াটা হারিয়ে গেছে। বাগানের ইচ্ছে আমার আর নেই।
সময় অনুমান করে অভিমানের কথা।
ওকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার গলায় বলে, তোমার না থাক আমার আছে। দেখো তোমার বাড়িটা 'ফুলের বাড়ি' করে দেবো। শুধু আর কিছু-দিন ধৈর্য ধরে চেপে চুপে থাকা।

২৪

রণু বলেছিল, এয়ারপোর্টে যাব না আমি। তুই যে চোখের সামনে দিয়ে সশব্দে আকাশে উড়ে যাবি, আর আমি মাটিতে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবো, এ সহ্য হবে না।
তবু গিয়েছিল।
না গেলে লোকলজ্জা।
কাকা কি বলবে? বিবোপিসি কি বলবে? সবাই যাবে। কাকী যে কাকী, সে পর্যন্ত সেদিন লাট্টুর অনারে তাসখেলা ভাসিয়ে এয়ারপোর্টে এলো। ছোট্ট বাদশা ? সে তো শুনে পর্যন্ত কান্না জুড়েছিল—আমি দিদির সঙ্গে যাবো। প্লেনে চড়ে আকাশে উড়ে উড়ে।

লাট্টু বলেছিল, দেখো ওই ছোট্ট ছেলেটাও তোমার থেকে হৃদয়বান। তোমার যদি ওর মতো কান্না পেতো, ঠিক চলে যেতে পারতে।

রণু জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলেছিল 'অধ্যয়ন তপঃ।' আমি গিয়ে বিঘ্ন ঘটাতাম কিনা কে বলতে পারে।

তোমার কথা শুনলেই সেই প্রবাদ বাক্যটা মনে পড়ে যায় রণুদা, 'খলের ছলের অভাব নেই।'

আমার সম্পর্কে এই মনোভাব তোর ?

যা সত্যি তাই তো হবে। খল না হলে বেচারী কাকার প্রস্তাবটাকে বাতিল করে দিতে অত ছলনা করতে পারলে কী করে।

হ্যাঁ প্রস্তাবটা বাতিলই করে দিয়েছিল রণু।

সরাসরি কান্তিকুমারের মুখের উপরই বলেছিল, এটা যেন সেই সেকালের ট্রিটমেণ্টের মতো লাগছে। প্রায় রক্ষাকবচ, রক্ষাকবচ।

কান্তিকুমার বলেছিলেন, রক্ষাকবচ জিনিসটা মন্দই বা কী ? অনেক অসু-বিধে থেকে রক্ষা করে।

আমার ঠিক উল্টো ধারণা।

কেন বলো তো ?

মনে হচ্ছে আইন-কানুনের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেললে, নিজের কোনো ক্রেডিট্ থাকবে না।

ক্রেডিট্ !

ওই আর কি। নিজেকে যাচাই করার পক্ষে—সব কিছু খোলা থাকাই তো ভালো।

কান্তিকুমার বলেছিলেন, অনু তোরও কি তাই মত ?

লাট্টু বলেছিল, এ পর্যন্ত অনেক বেহায়া হয়েছি কাকা, আর আমি কোনো কথায় নেই। তোমরা যা ঠিক করবে শিরোধার্য করে নেব।

অতএব রেজিস্ট্রিটা হলো না।

তবু বিশ্বাসটা স্থির রইল।

রণু বললো, মনে মনে তুই নিজেকে মিসেস চৌধুরী ছাড়া আর কিছু ভাববি না।

লাট্টু চোখ তুলে আস্তে বলেছিল, তুমি বড় নিষ্ঠুর রণুদা।

'ভালবাসার আর এক নাম নির্যাতন' জানিস না?

জানছি। ক্রমশই জানছি।

বিভা বলেছিল, কানু যা বলেছিল, শুনলেই তো হতো রে রণু। পৃথিবী বড় ভয়ানক জায়গা! কে বলতে পারে কাকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। হয়তো তোরা দু'জনেই বদলে যাবি।

সেখানেই তো পরীক্ষা পিসি।

বিভা রেগে বলেছিল, দরকার কি এতো অগ্নিপরীক্ষায়?

রণু তখন হেসে ফেলেছিল।

আর বলেছিল, আসলে কথা কি জানো? চিরকালের সেই নাপিত পুরুত চেলি টোপর, লোকজন হৈ-চৈ এগুলো না হলে যেন বিয়ে বলে বিশ্বাসই হয় না।

বিভা হতাশ নিশ্বাস ফেলেছিল, তা একথা আগে বললি না কেন? সেই ব্যবস্থাই হতো। কানু তো সবেতেই একপায়ে খাড়া।

রণু হেসে উঠেছিল, লোকে গালে চুনকালি দিতো পিসি। পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথায় টোপর।

আরে বাবা, অতো ইয়ে কিসের? তুই-ই কিছু কম? বিলেতে না গেলে আর মানুষ হয় না?

বিভার কাছে ভারতবর্ষের বাইরে সবই বিলেত।

রণু হেসেছে, মানুষ হয় কিনা জানি না, তবে মানুষ বলে গণ্য হয় না। ওসব তোদের ফ্যাশানের কথা। এতো সব করে, কী চারখানা হাত-পা গজাবে? সহজ সাধারণ জীবনের থেকে সুখ আর কিছু নেই।

বিভা হঠাৎ উঠে গিয়েছিল।

লাট্টু পাঁচ ছ' বছরের মতো তার চোখছাড়া হয়ে যাবে এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না বিভার। কানু বলেছিল, মেয়েকে তো ছাড়তেই হয়। বিয়ে তো দিতেই হয়।

বিভা বলেছিল, তা সত্যি।

কিন্তু সেটা মুখে। মনে মনে বলেছিল, একজনের হাতে সঁপে দিয়ে পর-

গোত্তর করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে মন আপনিই বদলে যায়। তাছাড়া মস্ত সমস্যা হয়ে রইল এই রণু।

লাট্টু যেন না ঘরকা, না ঘাট্‌কা হয়ে থাকল।

মায়ের প্রাণ এতে স্বস্তি পায় কি?

তবু আয়োজন হতে থাকল।

এবং যথাদিনে যথাসময়ে সকলের চোখের জলের মধ্যে থেকে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আকাশে উঠেও গেল লাট্টু।

রণু আগে বলেছিল আসবে না।

তবু এসেছিল।

ছাড়াছাড়ি হবার আগে জনারণ্যের মাঝখানেই লোকের কান বাঁচিয়ে বলেছিল লাট্টু, ফিরে এসে তোমায় ঠিক এই রকম দেখতে পাব তো?

রণুর প্রতিজ্ঞা ছিল কিছুতেই সেন্টিমেণ্ট প্রকাশ করে বসবে না। তাই উত্তর দিয়েছিল, তা কি জোর করে বলা যায়? হয়তো একটু টাক পড়বে, হয়তো একটু ভুঁড়ি গজাবে, হয়তো দু-চারটে চুলই পেকে বসে থাকবে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

চোখের জলটা বড় ছোঁয়াচে জিনিস।

জলের পর্দা ঢাকা চোখ দুটো যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে দেখছিল। সেই বৃহৎ ঈগলটা তার রাক্ষুসে ডানা ঝাপটে মাটি ছাড়িয়ে শূন্যে উঠে পড়ল, সেই আকাশ বাতাস সমস্ত পরিবেশ জুড়ে একটা হাহাকার উঠল। হাহাকার উঠল চেতনার গভীরে, সত্তার সমস্ত অণু-পরমাণুতে।

ওই পাখা ঝাপটানির দারুণ শব্দটা যেন রণু নামের নির্বোধটাকে লক্ষ কণ্ঠে ধিক্কার দিতে দিতে চলেছে।

ক্রমশ আর ডানা দু'খানাকে আলাদা করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে একটি শুভ্ররেখা, ক্রমে শুভ্ররেখাটা ধূসর বিন্দুতে পরিণত হয়ে হারিয়ে গেল।

আর তখনই রণুর মনে হলো নিজেকে নিজে মারে। নিষ্ঠুর নির্দয়ভাবে মার চালিয়ে যায়। কী মুখ্যু সে, কী মুখ্যু!

ভাগ্য একটা বিশাল সাম্রাজ্যের দলিল তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাধাসাধি করেছিল, রণু হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে সেই দলিলখানা।

এই ভয়ানক মুখ্যুমিটা না করলে কি এমন হাঁ করা একটা বিরাট শূন্যতা গ্রাস করে ফেলতো না তাকে।

এ কি শুধুই মন কেমনের কষ্ট?

না অনুশোচনার?

আর অনুশোচনার বাড়া যন্ত্রণা আর কী আছে?

আশ্চর্য! সবটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ঠিক পরমুহূর্তেই ভুলটা ধরা পড়ল। এক মুহূর্ত আগেও নয়। তখনো পর্যন্ত 'ঠিক করেছি' বলে কতই আত্ম-প্রসাদ।

অথচ 'নিজের মনকে চিনি' বলে কতই অহঙ্কার।

টেনে চলতে হবে এই অহঙ্কারের জের।

অবিরতই ভেঙে পড়া মনকে দাঁড় করিয়ে করিয়ে বলতে হবে, বল 'ঠিক করেছি, ঠিক করেছি।'

লাট্টু হয়তো আমায় সন্দেহ করল।

হয়তো ভাবল, বাধ্যবাধকতায় থাকতে চাই না বলেই আমি ইচ্ছে করে কিছু শৌখিন কথা বলে এড়িয়ে গেলাম। এরপর হয়তো আমি আর ওই রিসার্চটা নিয়ে থাকতে পারব না। এখনি ইচ্ছে হচ্ছে আমার দূরে কোথাও চলে যাই। যাহোক কিছু চাকুরি নিয়ে।

অসহ্য লাগছে এই পরিচিত জগৎটা।

ধূসর লাগছে সব কিছু।

রণু ভাবতে চেষ্টা করে, রণুকে যেন 'ছুয়ো' দিয়ে যে মেয়েটা আকাশে উড়ে গেল, সে যদি 'মিসেস চৌধুরী'র পরিচয় গায়ে সেঁটে নিয়ে যেতো, রণু কি এমন হাহাকার অনুভব করতো? রণু কি ভাবতে বসতো পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দূরে কোথাও চাকরি নিয়ে চলে যাই। যাহোক চাকরি।

নাঃ। রণু তক্ষুনি বাড়ি ফিরেই চিঠি লিখতে বসতো। খামের উপর ঠিকানা লেখবার সময় মিসেস চৌধুরী লিখতে প্রাণের সব ভালবাসাটা আঙুলের

ডগায় নেমে আসতো।

আর এই পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে তিলে তিলে মধু সঞ্চিত হয়ে হয়ে ভরে উঠতো মনের মৌচাক। নিজেকে এলোমেলো করবার কোনো উপায় থাকতো না। প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হতো ভালবাসার মানুষটার উপযুক্ত ভালবাসার ঘরখানি গড়ে তুলতে।

এখন নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। হয়তো 'দেবদাস'ই হয়ে যাবে রণু।

আর নয়তো 'প্রতীক্ষার' দিনরাত্রি গুণতে গুণতে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাবে, সরসতা হারিয়ে ফেলবে, বুড়িয়ে যাবে।

এই পরিণতিটা হালকা বুদ্ধি রণুর ভুলের ফসল।

২৫

কিন্তু ভুল কি শুধু হালকা বুদ্ধি রণুই করে বসল? মিথ্যে একটা আত্ম-মোহে?

রণুর চিরবিজ্ঞ বিচক্ষণ দাদা সমরবিজয়?

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে জীবনের যে ছকটা এঁকে নিয়ে তাতে রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছে সে, সেটাই কি ভুল ছাড়া আর কিছু?

মেয়ে মনের মাতৃত্বের ক্ষুধা কি 'ভবিষ্যতের' বাগানে ফুল ফোটাবার আশায় অপেক্ষার পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না? সে ক্ষুধা দিনে দিনে তিলে তিলে তাকেই ক্ষয় করে আনে না?

প্রতীক্ষার মধ্যে ক্রমশই দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষয়ের আভাস।

সমর যখন তার ভবিষ্যতের ছবিটা খুলে দেখায়, এই দেখো - এইটা হচ্ছে তোমার শোবার ঘর, এই তোমার বাথরুম, এই তার ওদিকে বারান্দায় বেসিন, আর এইদিক থেকে চলে যাচ্ছে তোমার রান্নাঘরের দিকে—

তখন প্রতীক্ষা স্তিমিত গলায় বলে, সবই আমার? তোমার কিছু নয়?

সমর আবার উৎসাহ দেখায়।

মৃদুমধুর হেসে বলে, আমার কী? দয়া করে তোমার বিছানার একপাশে

একটু জায়গা দিলেই বর্তে যাব।

তারপর আবার দেখায়, এই দেয়ালটার ধারে থাকবে তোমার বাবার দেওয়া ডবলবেড খাট, ওদিকে আলমারিটা। আর এই দুইয়ের মাঝখানে 'বেবিকট্'।

প্রতীক্ষা ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'আকাশ কুসুম'!

সমর নিশ্চিত গলায় বলে, আকাশের 'কুসুমই' তো গো। হাত বাড়িয়ে পেড়ে আনতে হবে। তবে তার উপযুক্ত পরিবেশটা তো গড়ে তোলা চাই।

তোমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে বছরে পাঁচ-সাতটি করে আকাশের কুসুম এসে ঝরে পড়তো।

সমর কথাটার অর্থ বোঝে।

উত্তর দেয়, সেই দেখে দেখেই তো ঘেন্না ধরে গিয়ে জীবনের অন্য পরিকল্পনা।

সেই অন্য জীবনের পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য সমরবিজয় নামের ছেলেটা জীবন বিকোচ্ছে। ভুল ছাড়া আর কী? যাকে নিয়ে জীবন সে যদি ক্রমেই তার সব উৎসাহ হারায়, কী থাকবে জীবনের জন্যে?

রণু চলে যাওয়ার পর থেকে প্রতীক্ষা আরো বেশী স্তিমিত হয়ে গেছে। ওই ছেলেটাই ছিল বাড়িতে প্রাণের প্রবাহবাহক। বিয়ে হয়ে এসে পর্যন্ত প্রতীক্ষার রণুর সঙ্গে ছিল একটি বিশেষ স্নেহ সখ্যতার সম্পর্ক। যেন মরুভূমির মধ্যে একটু স্নিগ্ধ জলধারা।

নীহারকণা অবশ্য এটা দু'চক্ষের বিষ দেখতেন, কিন্তু রণুর প্রাবল্যে তাঁর সেই ক্ষুদ্রতাটুকু কোথায় ভেসে যেতো।

রণু চলে গেছে ভিলাইতে একটা চাকরি নিয়ে। যে চাকরিতে তার অধীত বিদ্যার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

রণুর মতো ছেলে হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অন্য ধরনের একটা চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়া হয়ে গেল, এ বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে না পরিচিত সমাজ।

কেন ? কেন ? কেনতে উত্তাল হয়ে ওঠে।

রণুর জবাব সংক্ষিপ্ত, কলকাতাটা বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

হিতৈষী জনেরা অর্থ সামর্থ ব্যয় করে লীলাধামে এসে এসে হানা দিয়ে পরামর্শ প্রদান করেন, মানে বুঝছ না ? এ বয়েসে তো হবেই এমন ! ছেলের বিয়ের চেষ্টা করছ না কেন ?

নীহারকণা কপালে করাঘাত করেন।

ত্রুটি রেখেছেন নাকি সে চেষ্টার ? কবে থেকেই তো তলে তলে চালাচ্ছিলেন চেষ্টা, কিন্তু ছেলে জানতে পেরে সাফ জবাব দিয়ে বসেছিল, ও মতলব ছাড়ো মা জননী ! মিথ্যে লোকের কাছে অপদস্থ হবে।

নীহারকণা যখন কড়া প্রশ্ন করেছেন, কেন ? রণু কি ভীষ্মদেব হতে চায় ? তখন রণুও কড়া জবাব দিয়েছিল, কেন ? কী দুঃখে ? তবে যাই করি, যখন করি তোমার পছন্দের পাত্রীকে নয় মা জননী।

কেন, আমার পছন্দের দোষটা কী ? বৌদি বলে তো মরে যাস, আমারই পছন্দের মেয়ে।

দাদার মতো ভাগ্যবান সবাই না হতে পারে। মোট কথা ওই বিয়ে বিয়ে ফ্যাচ্যাং তুলবে না।

সেই দুঃখই ব্যক্ত করেন নীহারকণা তাঁর ভবানীপুরের আত্মীয়জনদের কাছে। অনেকেই তো আসেন। রণুর জন্যেই যে তা অবশ্য ঠিক নয়। অনেকেই আসেন নিমন্ত্রণ পত্র হাতে নিয়ে।

নীহারকণা তাতেও কপাল চাপড়ায়।

যে যেখানেই ছিটকে যাক ওদের জীবনে তো পরিমিত ধারাটা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

মেজ কর্তার ছেলের বিয়েয় নেমন্তন্নে গেলেন, তারপরই নেমন্তন্নে গেলেন সেই বৌয়ের 'সাধে'। আবার পরবর্তী যাত্রা নাতির অন্নপ্রাশনে। ন কর্তারও ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। বড় ভাসুরপোরও মেয়ের বিয়ে লেগেছে। এদিকে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েগুলোও তাদের জীবনের করণ কারণের খবর নিয়ে ছুটে ছুটে আসে নেমন্তন্ন করতে।

নীহারকণার আজ পর্যন্ত একবারও সে সৌভাগ্য হলো না।

আক্ষেপ শুনে রণু একবার বলেছিল, এতো শখ তো শুধু শুধুই একবার সবাইকে ডেকে খাইয়ে দাও না বাবা। লৌকিকতার দায় না বয়েই লোকে একটু শান্তির নেমন্তন্ন খেয়ে বাঁচে।

নীহারকণা মুখ বাঁকিয়েছিলেন, ভারী দায় পড়েছে। ভূতে পায় নি তো আমায়। তাই শুধু শুধু ভূতভোজন করাব।

তবে আর কী করা?

মাকে ভূতভোজন করাবার একটা উপলক্ষ ছোট ছেলেও দিলো না, বড় ছেলেও দিচ্ছে না। নীহারকণা জীবনভোর শুধু আশীবাদের পরিবর্তে লৌকিকতার মান বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে আসবেন। এমন আশ্চয্যি, ছেলেরা তো নয়ই বৌটি সুদ্ধ, যেতে চায় না। বেশ গা ঝেড়ে বলেন, আপনারাই তো যাচ্ছেন মা, ওতেই যথেষ্ট।

মনে মনে অবশ্য হৃষ্টই হন নীহারকণা। সারা পথ ভুবনবিজয়কে জ্ঞান দিতে দিতে যাবার সুবিধে হয়, সেখানেও সুবিধে হয় বৌ সম্পর্কে ইচ্ছামতো মন্তব্য করবার। বৌ যে নিজের 'স্বাধীনতা' কায়েম রাখতে ইচ্ছে করে নীহারকণাদের নাতির মুখ দেখতে দিচ্ছে না, এটা ঢালাও করে জানাবার সুবিধে কোথায় বৌও সঙ্গে গেলে?

প্রতীক্ষার কাছে কি এই হৃদয় রহস্য ধরা পড়ে গেছে? তাই সে ছুতো করে এড়ায়?

কিন্তু ওসব আক্ষেপ তো আলাদা।

ছোট ছেলে হঠাৎ পড়াশুনো ছাড়ল কেন? হাসি মজা ছাড়ল কেন? কলকাতা ছাড়ল কেন?

ঘোর চিন্তায় পড়ে নীহারকণা সন্দেহজনক আসামীকেই জিগ্যেস করেছিলেন, বৌমা, তোমার সঙ্গে তো রণার খুব ভাব। তুমি বলো দিকিনই কারণটা কী?

কারণটা যে কী, সেটা প্রতীক্ষা অনুমান করেছে বৈকি। কিন্তু সেকথা তো বলা যায় না। শুকনো মুখে বলেছে, আমিও তো বুঝতে পারছি না।

অতঃপর নীহারকণা আসল আসামীকেই চেপে ধরেছিলেন, পড়াশোনা ভালো লাগছে না যাক। এতোগুলো পাশ করে আবারও পড়ার কী

দরকারই বা ছিল ? তা দেশছাড়া হবার কী দরকার পড়ল ?
রণু অম্লানবদনে উত্তর দিয়েছিল, বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবার ভয়ে।
তার মানে ? বুদ্ধি হারাবার ভয়ে মানে ?
মানে তো সোজা। অবিরত গরুর সঙ্গে সহাবস্থানের ফল ফলবে তো ?
হ্যাঁ এতোদিনে ভুবনবিজয়ের ইচ্ছের গাছে ফুল ফুটেছে। গোয়ালের চালা উঠেছে বাড়িতে, গরু পোষা হয়েছে, এবং আশা করা যাচ্ছে খাঁটি দুধের আস্বাদের স্বাদ অদূরে।
ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।
সেই রথীন ঘটক।
ভুবনবিজয়ের অফিসের বন্ধু। একদা ভুবনবিজয় যাঁকে মনের ইচ্ছে জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, এতোদিন পরে তিনি হঠাৎ একদিন উদয় হলেন, সঙ্গে গরু নিয়ে। বিলম্বের জন্যে যথাবিধি অনেক লজ্জা কুণ্ঠা প্রকাশ করলেন। যথাবিধি বহুবিধ কারণ কৈফিয়ত দর্শালেন। গরু বাবদ ন্যায্য মূল্য নিয়ে বন্ধুর গৃহে ভূরিভোজ করে চলে গেলেন। এবং ছেলের বিয়ের নেমন্তন্নর চিঠিপত্র দিয়ে গেলেন।
বোঝা গেল গরুটা তাঁর নিজের 'গোয়ালেরই দৌহিত্রী'। এবং এতোদিন টাঙিয়ে রেখেছিলেন ওই আশায়।
ইচ্ছের গাছ যখন শুকিয়ে এসেছিল, তখন হঠাৎ আবার তাতে জল সিঞ্চনে, প্রথমটা অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন ভুবনবিজয়। কারণ তার ক'দিন আগেই প্রতীক্ষার ফুলবাগান 'গরুতে মুড়িয়েছে'। সেই জায়গাতেই তো গরুর ঘর উঠবে।...
কিন্তু বন্ধুর কাছে তো ছোট হওয়া যায় না।
বলা যায় না, এখন আর শখ নেই ভাই। ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।
সেই ঘাড়ে পড়া সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কিছুদিন লজ্জাতেই ছিলেন ভুবনবিজয়। নীহারকণা অবশ্য নয়। তিনি 'মা ভগবতীর আবির্ভাব' নিয়ে অনেক আদিখ্যেতার বাড়াবাড়ি করেছিলেন। দেখে রণু বলেছিল, 'ভগবতীর আবির্ভাব'! এটা তো সোজা অকেশন নয়। এই উপলক্ষেই তো তুমি একটা ভোজ লাগিয়ে দিতে পারো মা।

নীহারকণা রেগে গনগনিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ভুবনবিজয়ের ব্যাপার আলাদা হয়ে গেল।

তিনিই লজ্জায় প্রতীক্ষার দিকে তাকাতে পারছিলেন না। হঠাৎ চাকা ঘুরে গেল। প্রতীক্ষাই লজ্জায় তাঁর দিকে তাকাতে পারল না আর।

ঘটনাটা ঘটে গেল আকস্মিকই।

বাজার থেকে ফিরে এলেন ভুবনবিজয়, মুখ থমথমে কালচে। থলিটা নামিয়ে রেখে চৌকিতে বসলেন।

প্রতীক্ষা পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাবা, আপনার শরীর খারাপ লাগছে ?

ভুবনবিজয় বললেন, নাঃ।

তারপরই বলে উঠলেন, সমর সল্ট লেক-এর ওদিকে জমি কিনে বাড়ি করছে ?

প্রতীক্ষা যেন আচমকা চড় খেল।

প্রতীক্ষা থতমত খেয়ে গেল।

বাড়ি করছেন !

ভুবনবিজয় যেন একটু প্রত্যাশার গলায় বললেন, তুমি জানো না ?

মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোল না প্রতীক্ষার।

অস্ফুটে বললো, জমির কথা জানি। বাড়ির কথা ঠিক—

ভুবনবিজয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, এক ভদ্রলোক পথে 'লীলা-ধামের' ঠিকানা খুঁজছিল, তাড়াতাড়ি বললাম, আমারই বাড়ি। সমর-বিজয় চৌধুরী আমারই ছেলে। তাই বললো, তাহলে তো ভালোই হলো, আপনার ছেলেকে বলবেন নতুন যে জমিটার বায়না করা হয়েছিল, তার এনকোয়ারি হয়ে গেছে। চটপট ফয়সলা করে নিয়ে যেন বর্ষার আগেই বাড়ি শুরু করেন। 'ভিতে' জল ঢুকে গেলে মুশকিল। বোলো তাহলে সমরকে।

বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে বললেন, নাম বললো, অবনীশ সরকার। এই যে কার্ড দিয়ে গেছে। রাখো।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতীক্ষার পায়ের কাছে মাটিতেই কার্ডটা ফেলে

দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

প্রতীক্ষা বুঝতে পারছিলো বুকটা ফেটে গেছে ভুবনবিজয়ের।···ছেলের ব্যাপারটা তিনি গণ্য করেন নি। প্রতীক্ষা যে জমির কথা জেনেও চেপে রেখেছে, এটা তাঁর বিশ্বাসের মূলে হাতুড়ি বসিয়ে দিয়েছে।

তার মানে শ্রদ্ধা আর স্নেহের একটা উঁচু আসন থেকে গড়িয়ে পড়ল 'প্রতীক্ষা' নামের চিরকালের সৎ বিশ্বস্ত মেয়েটা।

এর পর আর চোখ তুলে তাকাবে কী করে সে ওই মানুষটার দিকে? যিনি নাকি নিজের 'গোপন বাসনা'টুকু জানাজানি হওয়ায় লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন।···কিন্তু সেটুকু আর কতটুকু?···প্রতীক্ষাদের পাহাড়প্রমাণ অপরাধের কাছে?

নিজেকে তো প্রতীক্ষা ওই অপরাধের ঘটনা থেকে বাদ দিতে পারছে না। ···বারে বারেই তো সে সব রকমে প্রশ্ন করেছে, তোমার বাড়ির কতদূর?

আশ্চর্য! তবুও ওই স্নেহময় মানুষটা একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, কার্ডটা তোলো বৌমা। আর শোনো, একটি কথা—যখন যা হবে হবে। এক্ষুনি যেন তোমার শাশুড়ীর কানে না ওঠে। সামলাতে পারবে না।

কাজেই নীহারকণা এখনো শুধু ছোট ছেলের হৃদয়হীনতা নিয়েই মর্মাহত। কী করে বিশ্বাস করবেন তিনি, গরুর সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে হবে বলে ছেলে দেশছাড়া হয়ে যাচ্ছে? কারণের হদিস খুঁজে মরেন তিনি।

২৩

রণুর বন্ধুরা কিন্তু হদিস বার করে ফেলেছিল।

তপন বলে উঠেছিল, কী রে শালা। তোর 'লেত্তির লাট্টু' হঠাৎ কলের লাট্টু বনে গিয়ে হাত ছাড়িয়ে বোঁ করে আকাশে উঠে গেল বলে বেবাগী হয়ে যাচ্ছিস?

লেবু বলেছিল, থাম তপন। বেচারার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস নি মাইরি। তবে হ্যাঁ, কাকা একখানা বাগিয়েছিল বটে। তুই শালা একটু

লুটপুটু করে ওই কাকাকে ধরে একখানা—এস্‌কলারশিপ যোগাড় করে লাট্টুর লেত্তি হয়ে উড়ে গেলি না কেন ?

রণু বিরক্ত হয়ে চলে এসেছিল।

আর কারো সঙ্গে দেখা করতে যায় নি।

তারপর নিরাড়ম্বরে চলে গেল একদিন।

নীহারকণা বলেছিলেন, বিদেশ বিভূঁই, কোথায় খাবি, কি করবি, প্রথমটা আমি তোর সঙ্গে যাই।

রণু সেকথা নস্যাৎ করে দিয়েছিল, আমিই কোথায় গিয়ে উঠি তার ঠিক নেই, তুমি যাবে কি ? দেখো এখন ক'দিন থাকি। হঠাৎ কলকাতার জন্যে মন কেমন করলেই হয়তো চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে আসব।

কিন্তু পালিয়ে কি এলো রণু নামের সেই ছটফটে জ্বলজ্বলে ছেলেটা ? বরং কলকাতা থেকেই প্রায় মুছেই গেল সে। কলকাতায় এলেই তো সেই মানুষটার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে। যে নাকি রণুর নীরেট বোকামির সাক্ষী। অথবা যে রণুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে। যে বলেছিল, নিজের মধ্যে যখন নিশ্চিত বিশ্বাস, তখন বাঁধাবাঁধিতে আটকাতেই বা আপত্তি কী ? দ্বিধা থাকলেই আপত্তি।

সেই কান্তিকুমারের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস নেই রণুর, যতদিন না লাট্টু নামের মেয়েটা ফিরে আসছে।

ততোদিন রণু এই একঘেয়ে নীরস জীবনে বিরক্তিকর কর্মের বোঝাকেই টানতে টানতে দিন রাত্রি পার করে করে চলবে। ভবিষ্যতের রঙিন ছবির কল্পনায়।

কিন্তু সেই কল্পনাই কি কোনো দৃঢ়ভূমিতে প্রোথিত থাকবে ? অনবরতই কি মনে হতে থাকবে না, আমি বুদ্ধু, তাই প্রতীক্ষার প্রহর গুণে চলেছি। কিন্তু কে গ্যারান্টি দিচ্ছে আমায় সেই লাট্টু ফিরে আসবে যথাযথ। এসে বলে বসবে না, বুঝলে রণুদা, দেখলাম পৃথিবীটা অনেক বড়। তাকে চিরদিনের ছোট পরিধি দিয়ে মাপা যায় না।

হয়তো লাট্টু নামের সেই মেয়েটারও একই অবস্থা।

সেও হয়তো দিন মাস বছর গুনে চলতে চলতে ভাবছে, আমি তো 'আমাকে' সেই ফেলে আসা জীবনের ঝিনুকের খোলার মধ্যে ভরে রেখে দিয়ে প্রতীক্ষার শেষ ক্ষণের জপ করে চলেছি, কিন্তু ফিরে গিয়ে সেই চঞ্চল চিত্ত অস্থির ছেলেটা কি ঠিক তেমনিই ফিরিয়ে পাব? ···নাকি আর কেউ এসে দাঁড়াবে আমার সামনে?

আমার 'আমি'টাকে তো ঝিনুকের খোলায় ভরে রেখেছি কিন্তু বহিরঙ্গে তো অনেক পরিবর্তনের প্রলেপ পড়ে যাবে। ও কি সেইটাকেই 'আমি' বলেই ভুল করবে? যা অভিমানী। আবার এক সময় এ কথাও ভাবে বেহায়া মেয়েগুলোকে বিশ্বাস নেই। কোনো একটা কেউ গায়ে পড়ে 'ভাব' করে ওকে খপ্পরে ফেলে দখল করে নেয় নি তো?···ভগবান!

তা হলে?

আমার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার বাগানে কোন্ ফুল ফুটবে? কাঁটার?

ছেলেবেলায় ইস্কুলের বইতে পড়েছি, 'সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়—'

এখন দেখছি 'সময়' জিনিসটা বইতে জানে না। অনড় অচল। ··এখনো কত দিন বাকি।

তবু সময় বয়েই যায় বৈকি।

কোথাও তরতরিয়ে, কোথাও পাথর ঠেলে ঠেলে।

'প্রতীক্ষা' নামের মেয়েটা ভাবে 'সময়' যেন তার উপর শিকড় গেড়ে বসে-আছে। সমর বলেছিল বাড়িটা খাড়া করতে বড়জোর মাস আষ্টেক দশ। ছোট্ট তো বাড়ি।···

প্রতীক্ষার মনে হয় আট-দশ মাস সময়টা কি এতো অফুরন্ত? সময় যেন অনন্তকাল পার হতে হতে ক্যালেণ্ডার এক একবার পাতা উল্টোয়।

ভুবনবিজয়ের সামনে থেকে নিজেকে নিয়ে সরে যেতে পারবার 'দিন'টা পাবার জন্যেই প্রতীক্ষার এই দিন গোনা। বাড়ির জন্যে নয়, বাগানের জন্যে নয়। নীহারকণার হিংসাকুটিল দৃষ্টির আওতা থেকেও নয়, এমন কি

সমরের অর্ডার দিয়ে রাখা 'বেবি কট্'-এর চিত্রে সার্থকতার রেখা টানতেও নয়, শুধু ভুবনবিজয় নামের ওই সম্ভ্রান্ত-হৃদয় ব্যক্তিটির সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে।...

একদা একদিন তিনি তাঁর 'সুভাষচন্দ্র' শোনাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়েছিলেন। উৎফুল্লমুখে বলেছিলেন খুব হিজিবিজি তরকারি নিয়ে এসে তোমার শাশুড়ীকে জব্দ করে ফেলে আমরা আসর বসাবো বুঝলে বৌমা? ডুমুর এঁচোড় পাটশাক থোড় মুখীকচু।...ছুটি আছে বলে তুমি যেন আবার শাশুড়ীর গাড্ডায় পড়ে গিয়ে বঁটি নিয়ে বোসতে যেও না।...

কী মজা মজা খুশী খুশী লেগেছিল তার মুখটা তখন। বাজার যাবার সময়।

বাজার থেকে ফিরে?

অবনীশ সরকারের কার্ড হাতে নিয়ে যখন বলেছিলেন 'তুলে রাখো বৌমা—'

সেই মুখটা মনে পড়লেই প্রতীক্ষার ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।...

এ জীবনে কি কোনো দিন প্রতীক্ষা বলে উঠতে পারবে, আপনার 'সুভাষ-চন্দ্র' আর শোনা হলো না বাবা।...

তবু একই ছাতের তলায় থাকতে হয়।

প্রয়োজনবোধে কথাও বলতে হয় বৈ কি!

কিন্তু অদ্ভুত একটা মনস্তত্ত্বের তত্ত্বে, অবনীশ সরকারের কার্ডটা সমরকে দেয় নি প্রতীক্ষা। কী ভেবে কে জানে। সমর অন্তত শান্তিতে থাকুক এই ভেবে? নাকি প্রতীক্ষার হৃদয়ের গভীরের ওই যন্ত্রটাকে প্রতীক্ষা আলোর সামনে বার করে আনতে শক্তি খুঁজে পায় না বলে?

সমর যখন একদিন বলেছিল, পাড়ার লোক টোক সব এমন অভদ্র, আমার একজন বন্ধুলোক এ পাড়ায় এসে আমার নাম করে ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, একটা বুড়োলোক না কি বলেছে, 'আমি তার বাবা।' কী বিশ্রী বলো তো?...তখন প্রতীক্ষা জানলার পর্দাটাকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে।...টানবে না উল্টে দেবে, খানিকটা সরাবে না একখানা কপাটই বন্ধ করে দেবে এটা যেন গুরুতর একটা সমস্যা।

সুভাষচন্দ্রে আর হাত পড়ে না।

খাতাপত্রে ধুলো জমে ওঠে।

বেশী সময় চন্দনাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন ভুবনবিজয়। চন্দনার কাজ করবার জন্যে যে লোকটাকে রাখা হয়েছে তার কাজের থেকে কামাইটাই বেশী। অতএব ভুবনবিজয়কে গোয়ালের ধারে বঁটি পেতে বসে কুচিকুচি করে খড় কাটতে দেখা যায়, খোল ভূষি দিয়ে জাবনা মাখতে দেখা যায়। বাকি সময়টা অকারণেই তাব গায়ে হাত বুলোতে দেখা যায়।

প্রতিদান স্বরূপ শোনা যায়, চন্দনার একটি পরিতৃপ্তি মধুর হাম্বারব। কিন্তু নীহারকণা একেবারেই প্রসন্ন নন তার উপর। বলেন, ওর জন্যে রণা বাড়ি ছাড়ল।

ভুবনবিজয় কথা কমই বলেন আজকাল, তবু এ রকম কথার প্রতিবাদ করে ওঠেন, অবোলা জীবকে অকারণ দোষারোপ কোরো না। তাব পাখা গজিয়েছিল সে যেতই, ও কথাটা তোমায় ঠাট্টা কবে বলেছে, তাও বুঝতে পার নি।

নীহারকণা নিজস্ব নীতিতে তীক্ষ্ণ হন, না আমি কিছুই বুঝি না, সব বোঝো তুমি। এই যে তোমার প্রাণের বন্ধু তোমায় রামঠকানো ঠকিয়ে গেল, বুঝতে পেরেছিলে তুমি? বলেছিল না চার পাঁচ সের দুধ দেবে? দুবেলায় মেরে কেটে একসের পাঁচ পো দুধ! জানতো না ও? বন্ধু হয়ে এতো বড় বিশ্বাসঘাতকতা? ছি ছি!

ভুবনবিজয় মৃদু হেসে বলেছেন, বন্ধুই তো বিশ্বাসঘাতকতা করে। না তো কি শত্রুতে করবে? কথাটার তো তাহলে মানেই হয় না।

জানি না। তোমার ওসব কায়দার কথা বুঝি না। ওই চন্দনার পেছনে এতো খাটুনি, এতো পয়সা খরচ, দেখলে গা জ্বলে যায় আমার। উসুল হচ্ছে কিছু? ঘবে একটা কাচ্চাবাচ্চা হলো না, শুকনো এক গরু নিয়ে সোহাগ।

তুমিই তো 'ভগবতী ভগবতী' করে বিগলিত হয়েছিলে।

হয়েছিলাম। ওর গুণট্রন শুনে। চার পাঁচ সের করে দুধ দেবে, বটের আঠার মতো দুধ। ভেবেছিলাম অতো দুধ আর আমাদের কে খাবে, বৌ

খায না, ছেলে খায না, বণু আমাব চোদ্দবাব চা কফি খেতো, সেও বাড়ি ছাড়া হলো। ওই ছুব থেকে পাড়ায ঘবে ঘবে কিছু জোগান দবে ওই লোকটাব খবচা উঠিযে নেব। হায হায। বিবিগাক তোমাব এখনকাব বৌ ঝিব মতো বুক শুকনো —কপাল আব কাকে বলে।

হঠাৎ কথাব উপব থাবড়া মেবে থামিযে দেবার মতো চন্দনাব গলা থেকে গম্ভীব শব্দ ওঠে 'হাম্বা'।

যেন থামো ইতব কথা বাখো।

ভদ্র কথা কও।

২৭

কিন্তু এ সমস্ত তো 'লালাবানেব'ই লালাকথা।

প্রতীক্ষার 'প্রতীক্ষা'ব কি হলো?

সময তো বহে গেল অনেক। দিন মাস বছ

প্রতীক্ষাব জীবনেব বাগানে কি তাহলে ফল আর ফুটতে পেল না? তাব জীবনে জুটল না বাগানদাব বাড়ি? শুধু বৃথা কেটে প্রতীক্ষা নিযে প্রহর গুনল বেচাবী? প্রহব, মিনিট, সেকেণ্ড। বেবে নাব অবস্থায কাটিযেছে সেই প্রত্যাশাব দিনগুলো। তবুও মাথা হেট করেও ওই লালাবানেব খেতে হযেছে, শুতে হযেছে, কথা বলতে হযেছে

জানাজানি তো হযেই যায। সেই হযে যাওযাটাব পব নাহাববর্ণাব অভি ব্যক্তিটা অবশ্যই সুখকব হয নি প্রতীক্ষাব পক্ষে। অথচ প্রতীক্ষা অনেক কিছু চায নি। এইখানেই এক ফালি ছোট জমিতে কিছু ফুল ফোটাতে চেযেছিল। কিছু গোলাপ, কিছু বজনীগন্ধা, কিছু কাঞ্চন

সমব নিজেব মনের চাওয়াটাকে প্রতীক্ষাব চাওযাব উপব চাপিযে দিয়ে ভারাক্রান্ত প্রতীক্ষাকে একটা অবাস্তব ভূমিতে দাঁড় করিয়ে বেখেছিল কতগুলো দিন।

কিন্তু তারপর?

সেইখানেই রেখে দিয়েছে প্রতীক্ষাকে।

নাঃ, ওকথা বললে সমরের প্রতি অবিচার করা হবে।

সমর প্রতীক্ষাকে যত ছবির স্কেচ দেখিয়েছিল, সব ছবিই উজ্জ্বল রঙের তুলি বুলিয়ে বুলিয়ে উপহার দিয়েছে প্রতীক্ষাকে।

বিশ্বাস না হয়, চলে যাও সল্ট লেক ছাড়িয়ে ভি. আই. পি. রোডের কাছাকাছি। দেখতে পাবে হালকা গোলাপী রংয়ের সেই ছবির মতো বাড়িটি। সাদা গ্রীলের দরজা জানলা, সাদা গ্রীলের গেট।

গেটের গায়ে নেমপ্লেটে মিস্টার সমরবিজয় চৌধুরী, আর মিসেস প্রতীক্ষা চৌধুরীর নাম।

বাড়ির কোনো নাম নেই।

এখনো ঠিক হয় নি কী হবে। অথবা আদৌ হবে কি না।

গেটে ঢুকলেই সামনে এগিয়ে যাবার পথ, দুপাশে ফুলের সমারোহ। গোলাপের বেড, রজনীগন্ধার ঝাড়, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, কাঞ্চন, হাসনাহানা, লিলি। মানিপ্ল্যান্টের ঘেরাও করা কবা। জমির একটা কোণে না কি কৃষ্ণচূড়া গাছটা ছিলই। ফুল ধরে অজস্র। লাল সোনায় মেশামেশি। অপরূপ বর্ণ বৈচিত্র্য।

দেখলেন?

এখন ভেতরে ঢুকে প্যাসেজ পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান। খাবার টেবিল, ফ্রিজ, দেয়ালে গাঁথা রঙিন বেসিন—এই সবের পাশ দিয়ে ঢুকে যান বড় ঘরটায়।

দেখতে পাবেন ডবলবেড খাট, সুন্দর বেডকভারে মোড়া। তার উপর প্রতীক্ষার বিশ্রাম শয্যা। দেখতে পেলেন তো? এও দেখতে পাবেন বেবি-কটের মধ্যে জমকালো একটা জামা গায়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে এক শিশু।

হঠাৎ মনে হয় পুতুল নাকি?

চুপচাপ নিথর নিথর।

নীরক্ত শীর্ণ নির্জীব।

কিন্তু পুতুল নয়। পর পর দুবার অর্ধপথে থেমে যাওয়া মৃতসন্তান প্রসব করে জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া প্রতীক্ষার এই তৃতীয়টি পূর্ণাঙ্গ ফল। তবে শীর্ণ অপুষ্ট। ওকে এখন গড়ে তুলতে হবে। সেই বাবদাই ট্রেনড্ নার্স

রাখা।

ভাগ্যিস যাই, এখন সমরের অনেক টাকা, তাই অনেক টাকা দিয়ে ট্রেনড্ নার্স রাখতে পেরেছে ছেলের জন্যে। প্রতীক্ষার জন্যেও রাখতে হয়েছে আর এক আয়া।

ডাক্তারের নির্দেশ 'সম্পূর্ণ বিশ্রাম'।

নিজের জন্যে সমর আর কিছু চায় নি। বলেছিল. শুধু তোমার বিছানার পাশে একটু ঠাঁই পেলেই চলবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটুকুও বড় বেশী চাওয়া হয়ে গেছে। দু দুটো আয়া নার্সকে ঘরে জায়গা দিলে আর ঠাঁই বার করবে কোথা থেকে প্রতীক্ষা?

আচ্ছা, প্রতীক্ষার বাগানে ওরে এমন ফুল যোগালো কে সমর? পাগল নাকি? সমরের এতো সময় কেন, জগতে মালি নেই? শখের মালী? দামী দামী সার মেলে না দোকানে?

প্রতীক্ষা নিজে বাগানের সেবা করতে বসলে সারা ছিল এমনটি করে তোলা?

যেদিন শরীর একটু ভালো থাকে, বারান্দায় এসে বসে প্রতীক্ষা। হালকা বেতের চেয়ারে, হালকা চাদর গায়ে দিয়ে। সমর বসে, দেখেছ তোমার বাগানের বাহার?

আর বেবিকট এর ধারে এসে দাঁড়ান নার্স বলে দেখছেন, আপনার ছেলের হাসি? খুব হাসছে আজকাল।

আয়া আর নার্সমুক্ত সময় হচ্ছে ওরা যখন খেতে যায়।

তাও দিনে নয়, রাতে দিনের বেলা সমর কোথায় থাকে, কোথায় না থাকে।

সমর এসে দূরত্ব বাঁচিয়ে (হঠাৎ কখন ওরা এসে পড়ে) চেয়ারে বসে বলে, তোমার নার্সটা কী অহঙ্কারী। দিন অতোগুলো করে টাকা নিচ্ছে, অথচ ভাবটা যেন দয়া করে করছে।

প্রতীক্ষা শুধু একটু হাসে। স্বাস্থ্যের অভাবে হাসিটা মলিন দেখায়।

সমর এদিক ওদিক তাকিয়ে ঘরের শোভা সৌন্দর্য অবলোকন করে বলে, খুব তো ধিক্কার দিতে পয়সার পেছনে ছুটে ছুটে আমি নাকি যন্ত্র হয়ে গেছি। না ছুটলে এই রাজকীয় ব্যবস্থাগুলি হতো কী করে?

প্রতীক্ষা বলে, তা তো ঠিক।

সমর বলে, ঠিকমতো ওষুধপত্র খাচ্ছ তো?

না খেলে ওরা ছাড়বে?

সেই তো। তবে আর বেশী টাকা দিয়ে ট্রেন্‌ড নার্স লোক রাখা কেন?

কথা বলতে বলতে হয়তো হঠাৎ উঠে গিয়ে দোলনায় দোলা বিবর্ণ শিশুটার দিকে এক নজর তাকিয়ে বলে, কার মতো দেখতে হয়েছে বলো তো? তোমার মতো, না আমার মতো?

প্রতীক্ষা বলে, এতো ছোটতে কি বোঝা যায়?

নামটাম কিছু ঠিক করলে?

না তো।

বাঃ, করো কিছু। ভাবো।

ওর আর ভাবাভাবির কী আছে? বিজয়-এর আগে যা হোক একটা কিছু বসিয়ে দেওয়া এই তো?

বাঃ। তুমি যে বলেছিলে, 'বিজয়-টিজয়' আর চলবে না। ওতে কল্পনা খাটাবার সুযোগ নেই।

তখন বলতাম। এখন আর বলি না। বিজয় দিয়েই হবে।

সমর একটা হাই তুলে বলে, তোমার মাকে এতো করে বললাম এখানে এসে থাকতে, রাজি হলেন না। একা মানুষ, অনায়াসেই থাকতে পারতেন। তোমারও সুবিধে হতো। বললেন, তা হয় না।

প্রতীক্ষা বললো, ঠিকই বলেছেন। তা হয় না।

বাঃ। তা কেন? ছেলে না থাকলে হঠাৎ বিধবা হয়ে পড়া মা মেয়ের বাড়িতে এসে থাকে না? ভাইয়ের বাড়ি থাকার চেয়ে খারাপ?

প্রতীক্ষা ক্লান্ত গলায় বলে, ও কথা থাক।

তবে থাক। পরে কিন্তু কেউ বলতে পারবে না, জামাই দেখল না।

কে বলবে?

সমর এখন সংসারকে খুব চিনেছে। তাই বলে সংসারে বলবার লোকের অভাব? ও কথা বলবার জন্যেই তো মুখিয়ে থাকে।

তারপর আর একটু হাই তুলে বলে, দেখো, একতলাটা ভাড়া দেওয়াই

ঠিক করে ফেলছি।

ভাড়া!

সমর বলে, মোটা ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তুমি তো নিচের তলায় নামছোই না, বলতে গেলে পুরো তলাটাই বাজে খরচ। দোতলায় রান্নার ব্যবস্থাটা উঠিয়ে আনলেই—

প্রতীক্ষা একটু অদ্ভুত রহস্যময় হেসে বলে, তা তোমার কায়দা করে গেটে দাঁড়ানোর কী হবে?

সমর শব্দ করে হেসে ওঠে।

এটা নতুন হয়েছে। অনেক বদলের মধ্যে এ একটা বদল। আগে কখনো শব্দ করে হাসতে দেখা যেত না সমরকে। একেবারে রণুর বিপরীত প্রকৃতি ছিল ওর।

ওই সশব্দ হাসির মধ্যেই বলে সমর, সেই কবে এক দিন বলেছিলাম, মনে রেখেছ? শালা, ক'দিন দাঁড়িয়েছি? সময় কোথা?

আশ্চর্য। এখনো সমরের মুখে 'শালা' শুনলে চমকে ওঠে প্রতীক্ষা।

চমকানিটা অবশ্য আজকাল আর দেখায় না। বলে, সময় আর নেই। তা ঠিক।

কথা দিয়েই দিই, কী বলো? তোমার তো বাগান দেখা দোতলার বারান্দা থেকে? ব্যাঘাত ঘটবে না কিছু। ভাড়াটেদের শাসিয়ে রাখব, ফ্ল্যাট ভাড়া দিচ্ছি বটে, কিন্তু বাগানটি নয়। খবরদার টাচ্ টি করা চলবে না।

সমরের মুখে আত্মপ্রসাদের তৈলাক্ত মসৃণতা ফুটে ওঠে। ইচ্ছে করলেই যে ও কাউকে শাসাতে পারে, এর থেকে সুখের আর কী আছে?

আয়াদের গলা শোনা যাচ্ছে। এখুনি এসে পড়বে।

সমর উঠে পড়ে। আর একবার ছেলের দোলা-খাটের ধারে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, মার আক্কেলটা দেখছ? ছেলেটাকে একবার দেখতে পর্যন্ত এলো না। অথচ বাচ্চা বাচ্চা করে তো হেদিয়ে মরতো।

আক্কেল! হেদিয়ে! এ রকম সব শব্দের স্টক কোথায় ছিল সমরের? অবাক লাগে প্রতীক্ষার। বিরক্তিও। সেই বিরক্তির গলাতেই বলে, আঃ, আবার ওই কথা। বাবা তো এসেছেন।

তা অবশ্য এসেছে। সাহস দেখিয়েছে।

দরজার কাছে ছায়া পড়ে। সমর বেরিয়ে যায়।

এই রুটিন প্রতীক্ষার।

জানে না কতদিন বিশ্রামে থাকতে হবে তাকে। অথবা চিরদিনই।

প্রতীক্ষার পূর্বপরিচিত সমাজ প্রথমে খুব 'ছি ছি' করেছে প্রতীক্ষাকে। বুড়ো শ্বশুর শাশুড়াকে একা ফেলে রেখে আরামের সিংহাসনে এসে বসবার জন্যে চলে আসায়। তারপর ঈর্ষা করেছে। এখনও করে চলেছে। কারণ সমরের নাকি আরো বাড়বৃদ্ধি হচ্ছে। সবাই বলছে, 'একেই বলে পাতাচাপা কপাল'।

এই আরামের সিংহাসনের রুটিন বাঁধা একঘেয়ে ছায়া-ছায়া দিনগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা দিনে হঠাৎ আলোর ফুল ফোটে।

ভুবনবিজয় হঠাৎ চলে আসেন সেই লালাধাম থেকে এই ভি. আই. পি রোডের কাছাকাছি।

বলেন, তোমার শাশুড়ীর হাতের চা খেয়ে খেয়ে তো চায়ে বিতৃষ্ণা ধরে যাচ্ছে বৌমা। একটু জম্পেস করে চা বানাও তো।

শুনে রান্নার লোক বলরাম ছুটে আসে।

প্রতীক্ষা বলে, তুমি যাও। আমি নিজেই বানাব।

চলে যায় চায়ের সরঞ্জামের কাছে।

মাকে উঠে কাজ করতে দেখে অস্বস্তিগ্রস্ত বলরাম বোকার মতো তাকিয়ে দেখে ভাবে কাঠের ধোঁয়া, কয়লার ধোঁয়া নয়। হীটারে চা বানাতে মায়ের চোখ দিয়ে জল ঝরছে কেন ?

নিশ্চয় খাটুনির কষ্টে। শ্বশুরবুড়ো পাজী আছে। অন্য বাড়িতে পালিয়ে এসে প্রাণ বাঁচিয়েছে, তবু বৌকে খাটাবার তাল।

ভুবনবিজয় বলেন, এসো বৌমা। এই বারান্দায় বসে চা খাই। জায়গাটি বড় খাসা। তোমার কই ?

এই যে।

বারান্দায় পাতা হালকা বেতের চেয়ার দুটো টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসে

প্রতীক্ষা।

ভুবনবিজয় একটি 'আঃ' করে হেসে বলেন, চা জিনিসটাকে কী করে পাঁচনের মতো করা যায় বলতে পার বৌমা ?

প্রতীক্ষা হেসে ওঠে।

ভুবনবিজয় বলেন, ব্যাটার নামের কি ঠিক করলে ? স্বর্গবিজয় ? দশদিক্-বিজয় ?

বাঃ ! ঠিক করবার ভার আপনাকে দিয়েছি না ?

ভুবনবিজয় একটু এদিক ওদিক তাকান।

আচ্ছা ইয়ে, রণা এখানে চিঠিপত্র দেয় টেয় ?

প্রতীক্ষা ওই অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে। বেশ বুড়ো দেখাচ্ছে ভুবনবিজয়কে ? সময় কী দক্ষ চোর। নিঃশব্দে কখন যে আস্তে আস্তে দামী দামী জিনিসগুলো তুলে নেয়। নেবার সময় টেরও পাওয়া যায় না। হঠাৎ এক সময় চোখ পড়ে।

প্রতীক্ষা খালি চায়ের কাপটাকে একটু সরিয়ে রাখে। আস্তে বলে, খুব কম। মিডল ঈস্ট থেকে চিঠি আসতে এতো দেরি হয়। কোনো ঠিক নেই।

আশ্চর্য ! রণাটা মিডল ঈস্টে চলে গেল। আচ্ছা কেন বলো তো। এখানে তো ভালোই চাকরি করছিল।

ওখানেব সঙ্গে তুলনাই হয় না। মাইনের অঙ্ক শুনলে অবিশ্বাস আসে।

ভুবনবিজয় চেয়ারটাকে একটু নড়িয়ে আরো কাছে এনে হতাশ গলায় বলেন, এতো টাকা নিয়ে দরকারটা কী বলো তো বৌমা ? কী করবে এতো বেশী টাকা নিয়ে ?

প্রতীক্ষা হাসে। বৌয়ের জন্যে আয়া রাখবে, ছেলের জন্যে দামী নার্স। আর পোষা কুকুরের জন্যে মাংস কিনবে রোজ দু কিলো করে। একটু হেসে বলে, তা নয় আমেরিকা যাবার টাকা জমাচ্ছে।

এখন লাট্টুর কথা সকলের জানা হয়ে গেছে।

ভুবনবিজয় একটা গভীর নিশ্বাস চেপে ফেলে আস্তে আস্তে বাকি চা-টা শেষ করে নিচের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার এইখানটি আমার বড় ভালো লাগে। আমার একটা আপসোস মিটেছে।

আপসোসটা কিসের তা জানে প্রতীক্ষা। তাই শুধু একটু হাসে। ভুবন-বিজয় বলেন, নাঃ, সত্যিই, দেখবার মতো হয়েছে তোমার বাগান।

প্রতীক্ষা আর একটু হাসে, আমার কী ?

বলুন দাশরথীর।